নাওয়াক্বীদুল ইসলামের ব্যাখ্যায়

সংক্ষিপ্ত আলোচনা

শাইখ আবু মালিক আত-তামিমী আন-নাজদী (রহিমাহুল্লাহ)

আনাস মাহদী নাশওয়ান

অনূদিত

মাকতাবাতুল বায়্যিনাত

إِيْجَازُ الْكَلام فِيْ شَرحِ نَوَاقِضِ الإِسْلام

নাওয়াক্বীদুল ইসলামের ব্যাখ্যায়

সংক্ষিপ্ত আলোচনা

মূলঃ শাইখ আবু মালিক আত-তামিমী আন-নাজদী
(রহিমাহুল্লাহ)

অনুবাদঃ আনাস মাহদী নাশওয়ান

প্রকাশনায়ঃ মাকতাবাতুল বায়্যিনাত

শা'বান - ১৪৪৩ হিজরী

E'zajul kalam fee sharhi nawaqidil islam

by shaykh Abu malik at-tamimi Rah.

translation by: Anas mahdi nashwan

published by: Maktabatul Bayyinat

মাকতাবাতুল বায়্যিনাত

সূচিপত্রঃ

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়্যাহ رَحِمَهُ ٱللَّٰهُ বলেন, “লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ সাক্ষ্যদানের বাস্তবায়ন এই দাবি করে যে, আল্লাহর জন্য ভালবাসা হবে, আল্লাহর জন্য ঘৃণা করা হবে, আল্লাহর জন্য সম্পর্ক করা হবে ও আল্লাহর জন্য শত্রুতা করা হবে এবং আল্লাহ যা ভালবাসেন তা ভালবাসতে হবে ও আল্লাহ যা ঘৃণা করেন তা ঘৃণা করতে হবে।”

মাকতাবাতুল বায়্যিনাত

মুখবন্ধঃ

الحَمدُ لله مُعزِّ الإسلامَ بِنصْرِه ومُذِلِّ الشِّركَ بِقَهرِه والصّلاةُ والسّلامُ على رسُولِه وعلى آله وأصحَابِه أجمعِين أمّا بعْد؛

আল্লাহ তাবারকা ওয়া তা'আলা বলেন,

﴿وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِٱللَّهِ إِلا وَهُم مُّشْرِكُونَ﴾

"আর তাদের অধিকাংশ আল্লাহর প্রতি ঈমান আনা সত্ত্বেও তারা মুশরিক।"[1]

এই আয়াতের তাফসীরে ইমাম শাওকানী رَحِمَهُ ٱللَّهُ বলেন, "অর্থাৎ অধিকাংশ মানুষ আল্লাহকে সৃষ্টিকর্তা, রিযিকদাতা, জীবনদানকারী ও মৃত্যুদানকারী হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া ও সত্যায়ন করা সত্ত্বেও তারা আল্লাহর সাথে শিরক করে। তারা আল্লাহর সাথে অন্যের ইবাদাত করে যেমনটি জাহিলিয়্যাতের সময় তারা করত - তারাও আল্লাহ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ কে স্বীকৃতি দিত এবং তিনি তাদের সৃষ্টিকর্তা এও স্বীকৃতি দিত।"[2]

তিনি سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ আরো বলেন,

﴿فَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ﴾

"কাজেই তোমরা তাকেই ডাক, তার আনুগত্যে একনিষ্ঠ হয়ে।"[3]

প্রিয় নাবী ﷺ বলেন, "ইখলাসের সাথে ইবাদাত কর, অল্প আমলই যথেষ্ট হবে।"[4]

উপরোক্ত নছসমূহ দ্বারা আমরা এই বিষয়টি স্পষ্টভাবে বুঝেছি যে, আমাদেরকে অবশ্যই শিরক থেকে সতর্ক থাকতে হবে এবং আল্লাহর ইবাদাতের ক্ষেত্রে শিরক মিশ্রিত হওয়া বাঞ্ছনীয় নয়।

---

[1] সুরা ইউসুফ- ১০৬

[2] ফাতহুল কৃদীর- ৩/৭০

[3] সুরা গফির- ৬৫

[4] আল-জামীউছ-ছগীর- ২৯৭ পৃঃ

অতঃপর আমরা পুনরায় শুকুরিয়া জ্ঞাপন করছি মহান রব্বুল-আলামীনের। কেননা তিনি আমাদেরকে এই 'নাওয়াক্বীদুল ইসলামের ব্যাখ্যায় সংক্ষিপ্ত আলোচনা' কিতাবটি বাংলায় অনুবাদ ও প্রকাশনার তাওফিক্ব দান করেছেন।

শাইখুল মুজাদ্দিদ মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওয়াহহাব رحمه الله এর রচিত নাওয়াক্বীদুল ইসলামের ব্যাখ্যায় অনেকেই কিতাব রচনা করেছেন। কিন্তু তন্মধ্যে এই কিতাবটি বিশেষভাবে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত। এর অন্যতম একটি কারণ ব্যাখ্যাকার رحمه الله এর আল্লাহর সাথে সত্যাবাদিতা, ইলমকে আমলে বাস্তবায়ন করার অনুপম দৃষ্টান্ত। এছাড়াও বিষয়বস্তুর অপ্রয়োজনীয় দীর্ঘায়িত না হওয়া এবং ভাষার প্রাঞ্জল্যতা আপনার দৃষ্টি এড়াবে না।

আমরা আশাকরি কিতাবটি পাঠ করার মাধ্যমে বাংলা ভাষাভাষী মুসলিম ভাই ও বোনগণ নিজেদের ঈমান এবং আক্বীদাহ রক্ষায় সচেষ্ট হবেন। এর মাধ্যমে দুনিয়া ও আখিরাতের সফলতা অর্জন করবেন - আল্লাহ আমাদের এবং আপনাদের তাওফিক্ব দান করুন!

আমরা সর্বাত্মক চেষ্টা করেছি ভুল-ত্রুটি মুক্ত করে আপনাদের সমীপে উপস্থাপনা করতে। তদুপরি কোন ভুল দৃষ্টিগোচর হলে জানাতে দ্বিধা করবেন না।

এই কিতাবটি প্রকাশের ক্ষেত্রে যাদের সহযোগিতায় আমরা উপকৃত হয়েছি আল্লাহ তা'আলা সকল মুসলিমদের পক্ষ থেকে তাদেরকে জাযায়ে খাইর দান করুন! আমিন!

আপনাদের কল্যাণজনক দু'আয় আমাদের ভুলবেন না।

وَالحَمدُ لله ربِّ العٰلمِين وصلّي اللّٰهُ على مُحمّدٍ وعلى آله وصحبِه وسلّم

মাহমুদ যুবাইর

মাকতাবাতুল বায়্যিনাত

শা'বান - ১৪৪৩ হিজরী

প্রকাশকের ভূমিকাঃ

সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য যিনি আমাদেরকে তার দাসত্ব করার নি'আমতের মাধ্যমে অনুগ্রহ করেছেন। সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক আল্লাহর সর্বোত্তম সৃষ্টির ও আল্লাহর সর্বশেষ রাসুল মুহাম্মাদ মুস্তফার উপর এবং তার নিষ্কুলষ পরিবার ও সত্যবাদী সঙ্গীদের উপর।

অতঃপরঃ

এই কিতাব পরিচিত শাইখ আবু মালিক আত-তামিমী (আনাস আন-নাশওয়ান) حفظه الله দ্বীন ভঙ্গের কারণসমূহের ব্যাখ্যায় লিপিবদ্ধ করেছেন। বিগত কয়েক যুগ যাবৎ মুসলিমদের অগ্রযাত্রা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে - তারা ব্যাপকভাবে মানুষের জন্য এবং বিশেষকরে ইলম অন্বেষণকারীদের জন্য তাওহীদ ও আক্বীদাহ'র মাস'আলাগুলো স্পষ্ট বর্ণনা করার ব্যাপারে অগ্রগামী হচ্ছেন। এবং তারা এটা করছেন রাসুল ﷺ এর কথাকে অনুসরণ করে। আর ইসলাম ভঙ্গের কারণসমূহের ক্ষেত্রে এই ব্যাখ্যাটি উত্তম ও পরিপূর্ণ যা শাইখ حفظه الله লিখেছেন।

শাইখ তুর্কী বিন মুবারাক আল-বান'আলী حفظه الله উত্তম বিবেচনা করে নোট, বক্তব্য ও সারমর্ম দিয়েছেন। অতঃপর তিনি কিতাবের জন্য একটি ভূমিকা লিখেছেন।

অতঃপর শাইখ আবু আব্দিল বার আল-কুয়েতী حفظه الله এটা পুনঃনিরীক্ষণ করে এর প্রশংসা করেছেন।

শাইখ তুর্কী বান'আলী تقبله الله এর ভূমিকাঃ

সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য যিনি তাওহীদপন্থীদের সম্মানিত করেন এবং মুশরিক ও সমকক্ষকারীদের লাঞ্ছিত করেন। সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক তরবারি ও লোহা দিয়ে প্রেরিত সুসংবাদদানকারী এবং সতর্ককারীর উপর। এবং তার পরিবার, সঙ্গী ও তাদের উপরেও যারা সঠিক মানহাজের উপরে চলে।

অতঃপরঃ

শাইখ আবু মালিক আনাস আন-নাশওয়ান تقبله الله সত্যবাদী দা'য়ী ও আল্লাহ ভীরু আলেমগণের অন্তর্ভুক্ত - আমরা তার ব্যাপারে এমনটাই মনে করি আর আল্লাহই তার হিসাব গ্রহণকারী- তিনি ঐ সকল শাইখদের অন্তর্ভুক্ত যারা পর্যাপ্ত খাদ্যপানীয় এবং বসত-বাড়ি ও বাহন পরিত্যাগ করেছেন। তিনি সম্প্রতি সময়ে আমেরিকা ও তার অনুগতদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য খোরাসানে বেরিয়ে পড়েন। অতঃপর শামের উদ্দেশ্যে রওয়ানা দেন এবং মুসলিমদের খলিফাহ আবু বকর আল-বাগদাদী رحمه الله কে বাই'আত দিয়ে তার সৌভাগ্যবান সৈনিকদের অন্তর্ভুক্ত হন। তিনি শিক্ষা দিতেন, সঠিক পথ বাতলে দিতেন, ফিক্বহী বিষয়ে বুঝাতেন, ফাতাওয়া দিতেন, তিনি সীমান্ত পাহারা দিতেন (রিবাত করতেন) এবং যুদ্ধ করতেন যতক্ষণ না তিনি নুসাইরীদের -আল্লাহ তাদের অপদস্থ করুন- বিরুদ্ধে যুদ্ধে অগ্রগামী হয়ে পৃষ্ঠপ্রদর্শন না করে স্বচ্ছ পতাকাতলে লড়াই করে নিহত হয়েছেন।

এক কল্যাণ প্রত্যাশী শাইখের উত্তরাধিকারে যত্নবান হওয়া উপযুক্ত মনে করেছেন এবং তা বিশেষভাবে ও ব্যাপকভাবে মুসলিমদের মাঝে ছড়িয়ে দেওয়ার এবং বিতরণ করার ক্ষেত্রে অংশীদার হয়েছেন।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ ۝ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ ۝ ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَىٰ﴾

"আর মানুষের জন্য ততটুকুই রয়েছ যা সে চেষ্টা করে এবং তার প্রচেষ্টার ফল শীঘ্রই তাকে দেখানো হবে। অতঃপর তাকে পূর্ণ প্রতিফল প্রদান করা হবে।"[5]

মানুষের ইলম (জ্ঞান) এবং তা শিক্ষা দেওয়া তার চেষ্টার অন্তর্ভুক্ত।

আবু হুরায়রাহ رضي الله عنه থেকে বর্ণিত রাসুল ﷺ বলেছেন, "মানুষ যখন মৃত্যুবরণ করে তখন তার সকল আমল বন্ধ হয়ে যায় শুধুমাত্র তিনটি ব্যতীত। সাদাক্বায়ে জারিয়াহ অথবা এমন ইলম (জ্ঞান) যার মাধ্যমে

[5] সুরা নাজম-৩৯-৪১

উপকৃত হওয়া যায় অথবা এমন নেক সন্তান যে তার জন্য দু'আ করে।''[6]

শাইখ আবু মালিক আনাস আন-নাশওয়ান ﷾ এমন ইলম রেখে গেছেন যার মাধ্যমে উপকৃত হওয়া যায় - যেগুলো তার কিতাব, পুস্তিকা, দারস (আলোচনা) ও বিবরণসমূহে ছড়িয়ে আছে। এই কিতাবটিও তার রেখে যাওয়া কিতাবগুলোর মধ্য থেকে একটি।

আমরা আল্লাহর কাছে মিনতি করি, তিনি যেন আমাদেরকে এবং তাকে প্রতিদান দান করেন। আর আমাদের সর্বশেষ বক্তব্য হল সকল প্রশংসা জগৎসমূহের রব আল্লাহর জন্য। আল্লাহ সালাত ও সালাম বর্ষণ করুক সর্বশ্রেষ্ঠ নাবী ও রাসুলের উপর।

তুর্কী বিন মুবারাক আল-বান'আলী

শাওয়াল - ১৪৩৭ হিজরী

[6] মুসলিম-৩/১২৫৫-নং-১৬৩১

শাইখ আবু মালিক আত-তামিমী حفظه الله এর ভূমিকাঃ

সকল প্রশংসা জগৎসমূহের রব আল্লাহর জন্য। সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক মুজাহিদগণের ইমাম ও সকল সৃষ্টির নেতা যাকে ক্বিয়ামাতের পূর্বে তরবারিসহ প্রেরণ করা হয়েছে। যেন এককভাবে আল্লাহ তা'আলার ইবাদাত করা হয় - যার কোন শরিক নেই। হে আল্লাহ আপনি তার পরিবার, সঙ্গী-সাথী, তাবে'ঈগণ এবং ক্বিয়ামাত পর্যন্ত যারা উত্তমভাবে তাদের অনুসরণ করে তাদের উপর রহমত ও অসংখ্য শান্তি বর্ষণ করুন।

অতঃপরঃ

কিছু ভাই আমার নিকট আবেদন করেছে, আমি যেন ইসলাম ভঙ্গের কারণসমূহের ব্যাখ্যায় একটি প্রতিবেদন লিখি ও আমি এতে বিরক্তিকর দীর্ঘতা এবং ক্ষতিকর সংক্ষপ্তিতা পরিহার করি। ফলে আমি উত্তমভাবে চিন্তা করলাম। অতঃপর আল্লাহর নিকট সাহায্য চেয়ে আমার সাধ্যানুযায়ী প্রস্তুতি গ্রহণ করলাম। এবং যা সহজলভ্য হয়েছে তা আমি একত্রিত করা ও লিখা শুরু করলাম। আর এই সামান্য প্রচেষ্টা হল মানবীয় প্রচেষ্টা যা দ্রুততার উপর লিখা হয়েছে এমন পরিস্থিতিতে যে ব্যাপারে আল্লাহ অধিক ভালো জানেন।

যদি আপনি কোন ত্রুটি দেখতে পান তাহলে শূন্যস্থান পূরণ করে দিবেন

সুতরাং মহান ও উঁচু তো সেই যার মাঝে কোন ত্রুটি নেই

মূল্যবান ভাই আমার! আমি আপনার সামনে এই প্রতিবেদনটি উপস্থাপন করছি। আমি এর নামকরণ করেছি - "ইসলাম ভঙ্গের কারণসমূহের ব্যাখ্যায় সংক্ষিপ্ত আলোচনা।"

সুউচ্চ ক্ষমতাবান আল্লাহর নিকট কামনা করছি তিনি যেন এই প্রতিবেদনটির মাধ্যমে উপকৃত করেন, পুরো পৃথিবীকে এর উপকারে অন্তর্ভুক্ত করেন এবং এটাকে যেন কবুল করেন। আমিন!

আমাদের সর্বশেষ বক্তব্য হল সকল প্রশংসা জগৎসমূহের রব আল্লাহর জন্য।

আবু মালিক আত-তামিমী

১৪৩৩ হিজরী

লেখক رحمه الله **বলেন,** বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম।

ব্যাখ্যাঃ

লেখক তার কিতাব বিসমিল্লাহ্ দ্বারা দুইটি উদ্দেশ্যে শুরু করেছেনঃ

১. সম্মানিত কিতাবের অনুসরণ করে।

২. নাবী ﷺ কে সমর্থন করে। এইভাবে যে, তিনি তার অধিকাংশ সময়গুলোতে বিসমিল্লাহ্ দ্বারা শুরু করতেন। যেমন- লেখালেখি ও অন্যান্য বিষয়াদিতে। দুই শাইখ বুখারি ও মুসলিম আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাসের হাদিস বর্ণনা করেছেন। তিনি আবু সুফিয়ান رضي الله عنه থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, নাবী ﷺ হিরাক্লেলের নিকট লিখেছেন, “বিসমিল্লাহ্...... আল্লাহর রাসুল মুহাম্মাদের পক্ষ হতে রোমের বাদশাহ হিরাক্লেলের নিকট..........”

সতর্কীকরণঃ বিসমিল্লাহ্ বলার ব্যাপারে একটি হাদিস বর্ণিত হয়েছে যা প্রমাণিত নয়। খতিব তার ‘জামেয়ী’তে আবু হুরায়রাহ থেকে মারফু সূত্রে তা বর্ণনা করেছেন, “প্রত্যেক এমন গুরুত্বপূর্ণ কাজ যা বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম দ্বারা শুরু করা হয় না তা অসম্পূর্ণ।”

এটি একটি মুনকার খবর। হাদিসের হাফিযগণ এর ত্রুটি বর্ণনা। করেছেন এবং ইবনে হাজার, সুয়ুতী ও আল-বানী رحمهم الله এই হাদিসকে দুর্বল আখ্যায়িত করেছেন।

অতএব বিসমিল্লাহ্ দ্বারা শুরু করা সুন্নাহ যা নাবী ﷺ এর কর্ম থেকে সাব্যস্ত। যেমন পূর্বে আবু সুফিয়ানের হাদিস বর্ণিত হয়েছে যা সহিহাইনে বর্ণিত হয়েছে। আর এ হাদিস “প্রত্যেক এমন গুরুত্বপূর্ণ কাজ যা বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম দ্বারা শুরু করা হয় না তা অসম্পূর্ণ।” এটা দুর্বল যেমনটি আমরা উল্লেখ করেছি।

লেখক رحمه الله বলেন,

“আপনি জেনে রাখুন নিশ্চয়ই ইসলাম ভঙ্গের কারণসমূহ দশটি।’’

ব্যাখ্যাঃ

‘নাওয়াক্বীদ’ বা ভঙ্গের কারণসমূহঃ তা নাক্বীদ এর বহুবচন। তা বাতিলকারী ও নষ্টকারী। যখন তা কোন বস্তুর উপর আপতিত হয় তখন তা ঐ বস্তুকে বাতিল করে দেয় এবং নষ্ট করে দেয়। তিনি তা’আলা বলেন,

﴿ كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا ﴾

“ঐ মহিলার মত যে তার সূতা মজবুত করে পাকাবার পর সেটার পাক খুলে নষ্ট করে দেয়।”[7]

অর্থাৎ তা তাকে নষ্ট করে দিয়েছে এবং বাতিল করে দিয়েছে। যেমন ওযু ভঙ্গের কারণসমূহ। যখন তা ওযুর উপর আপতিত হয় তখন তা ওযুকে বাতিল করে দেয় ও নষ্ট করে দেয় এবং তা পুনরায় করা জরুরী হয়ে পড়ে। এমনিভাবে ইসলাম ভঙ্গের কারণসমূহ যখন তা বান্দার ইসলামের উপর আপতিত হয় তখন তা ইসলামকে নষ্ট করে দেয় ও বাতিল করে দেয়। এবং ভঙ্গের কারণ সম্পাদনকারী থেকে ইসলামের নাম ও গুণাগুণকে অকেজো করে দেয়। ফলে তাকে মুসলিম হিসেবে আখ্যায়িত করা হয় না। বরং মুরতাদ হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়।

লেখক ভঙ্গের কারণসমূহকে দশটিতে সীমাবদ্ধ করেছেন। অথচ আলেমগণ এর থেকে অনেক বেশি ভঙ্গের কারণসমূহ যুক্ত করেছেন। তাদের মধ্য থেকে কেউ চারশত ভঙ্গের কারণ যুক্ত করেছেন, কেউ নব্বইটি যুক্ত করেছেন। এখানে কেউ আরো অল্পসংখ্যক উল্লেখ করেছেন। আর যে ব্যক্তি আলেমগণের কিতাবাদীতে মুরতাদদের অধ্যায়ে লক্ষ্য করবে সে দেখতে পাবে যে, তারা অনেক ধরন উল্লেখ করেছেন যেগুলো দশের অধিক।

তাই ভঙ্গের কারণসমূহকে লেখক দশটি নাওয়াক্বীদে সীমাবদ্ধ করার ব্যাপারে আলেমগণ সম্ভাব্য কিছু কারণ উল্লেখ করেছেনঃ

১. ইসলাম ভঙ্গের কারণগুলো এই দশটি কারণের দিকেই প্রত্যাবর্তন করে।

২. এই ভঙ্গের কারণগুলো সবচেয়ে বিপজ্জনক ও সবচেয়ে বড়।

৩. এই ভঙ্গের কারণগুলো মানুষের মাঝে বেশি সংঘটিত হয় এবং অধিক বিস্তৃত।

৪. এই ভঙ্গের কারণগুলোর ব্যাপারে আহলুল ইলমগণের মাঝে ঐক্যমত রয়েছে।

---

[7] সুরা নাহল-৯২

লেখক رحمه الله বলেন,

"ইসলাম ভঙ্গের প্রথম কারণঃ

আল্লাহর ইবাদাতের ক্ষেত্রে শিরক করা। তিনি তা'আলা বলেন,

﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ ﴾

"নিশ্চয়ই আল্লাহ তার সাথে শরীক করাকে ক্ষমা করেন না। এছাড়া অন্যান্য অপরাধ যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন।"[8]

তিনি তা'আলা বলেন,

﴿ إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ ۖ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ ﴾

"নিশ্চয়ই যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে শিরক করে, আল্লাহ তার জন্য জান্নাত হারাম করে দেন। এবং তার আবাসস্থল জাহান্নাম। আর জালিমদের কোন সাহায্যকারী নেই।"[9]

এর মধ্যে রয়েছে আল্লাহ ব্যতীত অন্যের উদ্দেশ্যে যবেহ করা। যেমন যে ব্যক্তি জ্বিন অথবা কবরের উদ্দেশ্যে যবেহ করে।"

ব্যাখ্যাঃ

লেখক رحمه الله এই দশটি ভঙ্গের কারণকে আল্লাহর সাথে শিরক করা দ্বারা শুরু করেছেন দুইটি উদ্দেশ্যেঃ

১. কেননা তা সবচেয়ে বড় পাপ যার মাধ্যমে আল্লাহর অবাধ্যতা করা হয়। দুই ওহী কুরআন ও সুন্নাহ প্রমাণ করে যে, আল্লাহর সাথে শিরক করা সবচেয়ে বড় পাপ। তিনি তা'আলা বলেন,

﴿ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ ﴾

"নিশ্চয়ই শিরক মহা জুলুম।"[10]

---

[8] সুরা নিসা-৪৮

[9] সুরা মায়িদাহ-৭২

[10] সুরা লুক্বমান-১৩

সহিহাইনে আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ رضي الله عنه থেকে বর্ণিত হয়েছে তিনি নাবী ﷺ কে জিজ্ঞাসা করেন, তিনি বলেন, হে আল্লাহর রাসুল, আপনি আমাকে অবহিত করুন কোন পাপ সবচেয়ে বড়? তিনি বললেন, "তুমি আল্লাহর সাথে সমকক্ষ সাব্যস্ত করবে অথচ তিনিই তোমাকে সৃষ্টি করেছেন।" তিনি বলেন, তারপর কোনটি? তিনি বললেন, "তুমি তোমার সন্তানকে হত্যা করবে এই ভয়ে যে, সে তোমার সাথে আহার করবে।" তিনি বলেন, তারপর কোনটি? তিনি বললেন, "তুমি তোমার প্রতিবেশীর স্ত্রীর সাথে যিনা (ব্যভিচার) করবে।"

২. কারণ আল্লাহর সাথে শিরক করাটা মানুষের মাঝে অধিক বিস্তৃত পাপ। আল্লাহ عز وجل বলেন,

﴿ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِٱللَّهِ إِلا وَهُمْ مُشْرِكُونَ ﴾

"আর তাদের অধিকাংশরা আল্লাহর প্রতি ঈমান আনা সত্ত্বেও তারা মুশরিক।"[11]

তিনি سبحانه وتعالى সংবাদ দিয়েছেন যে, অধিকাংশ মানুষ আল্লাহর প্রতি ঈমান আনে সাথে সাথে তার সাথে শিরক করে। সুতরাং এই পাপটি অধিক বিস্তৃত হওয়ার কারণে লেখক এর মাধ্যমে শুরু করেছেন।

শিরকের শাব্দিক ও শারয়ী পরিচয়ঃ

শাব্দিকভাবে শিরক হলঃ তা মুশারাকা (শরীক হওয়া) থেকে গৃহীত। শরীক হওয়া হল দুইটি বস্তুর শরীক হওয়া। বিষয়গুলোর মধ্য থেকে একটিতে অথবা অনেক বিষয়ে অধিক হওয়া।

শারয়ী পরিভাষায় শিরক হলঃ আল্লাহ عز وجل এর রুবুবিয়্যাত অথবা উলুহিয়্যাত অথবা তার নাম ও সিফাতসমূহের ক্ষেত্রে তার অংশীদার সাব্যস্ত করা।

আহলুল ইলমগণ এইভাবেও পরিচয় দিয়েছেন যে, আল্লাহর বৈশিষ্ট্যসমূহের ক্ষেত্রে আল্লাহর সাথে আল্লাহ ব্যতীত অন্যকে সমান সাব্যস্ত করা।

আল্লাহর সাথে শিরক করা দুই প্রকারঃ

১. শিরকে আকবার (বড় শিরক)

২. শিরকে আসগার (ছোট শিরক)

এখানে কিছু পার্থক্য রয়েছে, যে কারণে বড় শিরক ও ছোট শিরক আলাদা হয়। যেমনঃ

* বড় শিরক মিল্লাহ থেকে বের করে দেয় এবং এর সম্পাদনকারীকে মুরতাদের হুকুমে ধরা হয়। ছোট শিরক এর বিপরীত।

[11] সুরা ইউসুফ-১০৬

* বড় শিরক সম্পাদনকারীর অবস্থা হল আখিরাতে সে চিরস্থায়ী জাহান্নামে থাকবে। ছোট শিরক সম্পাদনকারী এর বিপরীত।

বড় শিরকের কিছু উদাহরণঃ

যেমন- আল্লাহ ব্যতীত অন্যের উদ্দেশ্যে যবেহ করা। কবরবাসীদের জন্য - যেমন আওলিয়া ও সৎ ব্যক্তিদের উদ্দেশ্যে অথবা জ্বিন ও শয়তানদের জন্য যবেহ করা - তাদের প্রতি আগ্রহী হয়ে অথবা তাদেরকে ভয় করে। কবরবাসীদের, জ্বিন ও শয়তানদের থেকে এ ভয় করা যে, তারা তার ক্ষতি এবং অনিষ্ট করবে। আল্লাহ ব্যতীত অন্যের নিকট এমন কিছুর আশা করা যার ক্ষমতা শুধুমাত্র আল্লাহর রয়েছে - যেমন অনিষ্টতা দূর করা এবং উপকার করা। আর বর্তমান সময়ে সৎ ব্যক্তিদের কবরের নিকট অনেক সংখ্যক মানুষ এ কাজগুলো করে থাকে।

আহলুল ইলমগণ অনুসন্ধান করে তাওহীদকে তিন প্রকারে বিভক্ত করেছেনঃ

১. তাওহীদে উলুহিয়্যাহ

২. তাওহীদে রুবুবিয়্যাহ

৩. তাওহীদে আসমাউস সিফাত

এই তিন প্রকারের একটি অন্যটি ছাড়া যথেষ্ট হয় না। বরং এই তিন প্রকারের প্রত্যেকটির প্রতি ঈমান আনার মাধ্যমে একজন মানুষের তাওহীদ বাস্তবায়িত হবে।

আহলুল ইলমগণ তাওহীদের প্রকারসমূহের যে পরিচয় দিয়েছেন নিম্নে তা উল্লেখ করা হলঃ

তাওহীদে উলুহিয়্যাহঃ হল বান্দাদের কর্মসমূহের মাধ্যমে আল্লাহকে একক সাব্যস্ত করা। এটা এইভাবে যে, আপনি ইবাদাতমূলক কর্মসমূহ এককভাবে তার জন্যই করবেন যার কোন শরীক নেই। যেমন সালাত, সিয়াম, মানত, যবেহ ও বান্দাদের অন্যান্য কর্মসমূহ - যেগুলো আল্লাহ ব্যতীত অন্যের জন্য করা জায়েজ নেই। তিনি তা'আলা বলেন,

﴿ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝ لَا شَرِيكَ لَهُ ۖ وَبِذَٰلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ ﴾

"আপনি বলুন, আমার সালাত, আমার কুরবানী, আমার জীবন ও আমার মরণ সৃষ্টিকুলের রব আল্লাহরই জন্য। তার কোন শরীক নেই। আর আমাকে এরই নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে এবং আমি মুসলিমদের মধ্যে প্রথম।"[12]

তাওহীদে রুবুবিয়্যাহঃ হল আল্লাহর কর্মসমূহের ক্ষেত্রে তাকে একক সাব্যস্ত করা। আপনি বিশেষ সকল কাজের ক্ষেত্রে আল্লাহকে একক সাব্যস্ত করবেন এবং সেগুলোকে আল্লাহ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى ব্যতীত অন্যের জন্য

[12] সুরা আনআম-১৬২-১৬৩

নির্ধারণ করবেন না। যেমন সৃষ্টি করা, জীবিত করা, মৃত্যু দেওয়া, মালিক হওয়া, পরিচালনা করা এবং পরিকল্পনা করা।

তাওহীদে আসমাউস সিফাতঃ হল আপনি আল্লাহ ﷻ এর বিশেষ নাম ও সিফাতসমূহের ক্ষেত্রে আল্লাহকে একক সাব্যস্ত করবেন এবং এগুলোকে আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো জন্য ঘুরিয়ে দিবেন না।

তাওহীদের তিন প্রকারের ক্ষেত্রে বড় শিরকের উদাহরণসমূহঃ

তাওহীদে উলুহিয়্যাহ'র ক্ষেত্রে বড় শিরকের উদাহরণঃ

- মানুষের এই বিশ্বাস করা যে, আল্লাহ ব্যতীত অন্য কেউ ইবাদাত পাওয়ার যোগ্য।

- আল্লাহ ব্যতীত অন্যকে ডাকা অথবা আল্লাহ ব্যতীত অন্যের নিকট এমন বিষয়ের সাহায্য চাওয়া যার ক্ষমতা শুধুমাত্র আল্লাহর জন্য রয়েছে।

- আল্লাহ ব্যতীত অন্যের জন্য সালাত আদায় করা অথবা আল্লাহ ব্যতীত অন্যের উদ্দেশ্যে যবেহ করা অথবা হজ্জ করা অথবা আল্লাহ ব্যতীত অন্যের জন্য মানত করা।

তাওহীদে রুবুবিয়্যাহ'র ক্ষেত্রে বড় শিরকের উদাহরণঃ

- মানুষের এই বিশ্বাস করা যে, কেউ সৃষ্টি করতে পারে অথবা জীবিত করতে পারে অথবা মৃত্যু দিতে পারে অথবা মালিক হতে পারে অথবা এই সৃষ্টিজগতে আল্লাহর সাথে কর্তৃত্ব করতে পারে।

- এমন কথা বলা যে, আমরা অমুক তারকার কারণে অথবা অমুক নক্ষত্রের কারণে বৃষ্টি পেয়েছি। তাহলে সে বিশ্বাস করল যে, বৃষ্টি বর্ষণ করার ক্ষেত্রে এগুলো স্বনির্ভর।

- গঠনকৃত আইনসমূহ চালু করা।

তাওহীদে আসমাউস সিফাতের ক্ষেত্রে বড় শিরকের উদাহরণঃ

- মানুষের এই বিশ্বাস করা যে, আল্লাহর সাথে সাথে অন্য কেউ গায়েব (অদৃশ্যের জ্ঞান) জানে।

- মানুষের এই বিশ্বাস করা যে, এখানে এমন কেউ রয়েছে, যে দয়া বা অনুগ্রহ করতে পারে - যার উপযুক্ত আল্লাহ عَزَّ وَجَلَّ - অথবা তার মত ক্ষমা করতে পারে।

- যে ব্যক্তি আল্লাহ عَزَّ وَجَلَّ ব্যতীত অন্যের জন্য রহমান, আহাদ, অথবা সমাদ নাম ব্যবহার করে।

সৃষ্টিকারী عَزَّ وَجَلَّ এর নামসমূহ সৃষ্টির সাথে অংশীদার করার ক্ষেত্রে তা তিনভাগে বিভক্তঃ

প্রথমঃ এমন নামসমূহ যেগুলো عَزَّ وَجَلَّ এর সাথে এককভাবে নির্দিষ্ট। যেগুলোর ক্ষেত্রে কাউকে অংশীদার

করা হবে না। যেমন- আহাদ, সমাদ, কুদ্দুস, রহমান।

দ্বিতীয়ঃ এমন নামসমূহ যেগুলো আল্লাহর মাঝে এবং বান্দাদের মাঝে যৌথ। যেমন- রহিম। তিনি তা'আলা বলেন,

﴿ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ ﴾

"অবশ্যই তোমাদের নিকট তোমাদের মধ্য থেকেই একজন রাসুল এসেছেন, তোমাদের যে দুঃখ-কষ্ট হয়ে থাকে তা তার জন্য বড়ই বেদনাদায়ক। তিনি তোমাদের মঙ্গলকামী, মুমিনদের প্রতি তিনি করুণাশীল ও অতি দয়ালু।"[13]

মালিক, কারীম। যেমন সহিহ বুখারিতে বর্ণিত হয়েছে। যখন রাসুল ﷺ কে জিজ্ঞাসা করা হল "মানুষের মাঝে কে সবচেয়ে সম্মানিত? তিনি বললেন। কারীম ইবনে কারীম ইবনে কারীম।" অতঃপর তিনি উল্লেখ করলেন, ইউসুফ عليه السلام ইবনে ইয়াক্কুব ইবনে ইসহাক্ব ইবনে ইবরাহীম।

তৃতীয়ঃ এমন নামসমূহ যেগুলো আল্লাহর মাঝে এবং তার বান্দাদের মাঝে যৌথ। যদি এ নামগুলোতে গুণবাচকের (সিফাতের) অর্থের কোন অংশ থাকে তাহলে সৃষ্টিকারী عز وجل এর নামের সম্মান ও পবিত্রতার কারণে পরিবর্তন করা উচিৎ। যেমন আল-হাকাম। সুনানে নাসাঈ ও অন্যান্যতে আবু শুরাইহ'র হাদিস বর্ণিত হয়েছে - যখন এই ব্যক্তি তার সম্প্রদায়ের মাঝে বিচার করত এবং তার বিচারে উভয় বিবাদকারী সন্তুষ্ট হত। ফলে এই কারণে তাকে আবুল হাকাম কুনিয়াত (উপনাম) দেওয়া হয়। আর এটা হয় তার সম্প্রদায়ের মাঝে তার বিচারের কারণে। সুতরাং এখানে তা কেমন যেন সৃষ্টিকারীর সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ হয়ে যায় - আল্লাহ এব্যাপারে পবিত্র। নাবী ﷺ আবু শুরাইহের কুনিয়াত পরিবর্তন করতেন যদি এতে গুণবাচকের (সিফাতের) কোন অর্থের অংশ থাকত। আর যদি গুণবাচকের (সিফাতের) লক্ষ্য ব্যতীত শুধুমাত্র চিহ্নিত করার জন্য মানুষের আবুল হাকাম নাম দেওয়া হয় তাহলে এতে কোন সমস্যা নেই। কারণ যাকে আবুল হাকাম নাম দেওয়া হয়েছে নাবী ﷺ তাকে পেয়ে তার নাম পরিবর্তন করেননি।

শিরকের প্রকারসমূহের দ্বিতীয় প্রকার হল শিরকে আসগার বা ছোট শিরকঃ

এই প্রকারটি সুন্নাহ'তে বর্ণিত হয়েছে। হাদিসের বক্তব্যে একে শিরকে আসগার হিসেবে নামকরণ করা হয়। ইমাম আহমাদ তা বর্ণনা করেছেন, রাসুল ﷺ বলেন, "আমি তোমাদের ব্যাপারে সবচেয়ে বেশি ভয় করি শিরকে আসগারের (ছোট শিরকের)।" অতঃপর তাকে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন, "রিয়া (লোকদেখানো ইবাদাত)।"

এটাকে ছোট হিসেবে নামকরণ করার অর্থ এই নয় যে, তা গুরুত্বহীন পাপ। বরং তা গুরুতর পাপ, কবিরা গুনাহের অন্তর্ভুক্ত। এবং তা ইচ্ছার অধিনও নয়। যেমন এটাকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন শাইখুল ইসলাম

[13] সুরা তাওবা-১২৮

ইবনে তাইমিয়্যাহ এবং তার ছাত্র ইবনুল কাইয়্যিম। এমনকি যে ব্যক্তি এর উপর মৃত্যুবরণ করবে জান্নাতে প্রবেশের পূর্বে অবশ্যই তাকে পাকড়াও করা হবে। আর এটাকে ছোট হিসেবে নামকরণ করার কারণে হুকুমের ক্ষেত্রে এর মাঝে এবং বড় শিরকের মাঝে আমরা পার্থক্য করা জানতে পারব।

ছোট শিরক দুই প্রকারঃ

১. প্রকাশ্য ছোট শিরক।

২. গোপনীয় ছোট শিরক।

প্রকাশ্য ছোট শিরকের কিছু উদাহরণঃ

- মানুষ এমন বিষয়কে বিশ্বাস করে যা মাধ্যম হওয়ার মত কোন মাধ্যম নয়। যেমন মানুষ বিশ্বাস করে তাবীজ ঝুলানো ক্ষতি দূর করা ও উপকার লাভের মাধ্যম।

উপকারিতাঃ মাধ্যমসমূহ দুই প্রকার।

- শারয়ী মাধ্যম যার বৈধতা শারীয়াহ নির্ধারণ করেছে। যেমন কুরআনের মাধ্যমে চিকিৎসা লাভ করা এবং মধুর মাধ্যমে চিকিৎসা লাভ করা।

- দালিলিক বুদ্ধিভিত্তিক মাধ্যম যা অভিজ্ঞতা দ্বারা প্রমাণিত। যেমন বলা হয় - অভিজ্ঞতা দ্বারা প্রমাণিত যে, ডালিমের খোসা পেটের রোগের প্রতিষেধক। এই প্রকারকে আলেমগণ জায়েয বলেছেন। তবে শর্ত হচ্ছে তা হারাম হওয়ার ব্যাপারে শারীয়াহ থেকে কোন দলিল না থাকা।

প্রকাশ্য ছোট শিরকের আরো উদাহরণঃ

- যেমন কোন বস্তু মুছে (স্পর্শ করে) মানুষের এই বিশ্বাস করা যে, তাতে বরকত রয়েছে। অথচ আল্লাহ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى তাতে কোন বরকত দেননি।

- যেমন মানুষের এমন বলা যে, আল্লাহ যা চান এবং আপনি যা চান, যাদি আল্লাহ এবং অমুক না থাকত। এবং আল্লাহ ব্যতীত অন্যের নামে শপথ করা।

গোপনীয় ছোট শিরক দুই প্রকারঃ

১. রিয়া (লোকদেখানো ইবাদাত)

২. সুখ্যাতি

রিয়া এবং সুখ্যাতির মাঝে পার্থক্য রয়েছে। রিয়া আমলের মধ্যে সংঘটিত হয়। আর সুখ্যাতি আমলের পরে সংঘটিত হয়। কেউ বলে, আমি সুখ্যাতি ও প্রসিদ্ধির জন্য এমন এমন কাজ করেছি। সহিহাইনে ইবনে আব্বাস رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا থেকে বর্ণিত হয়েছে তিনি বলেন, আল্লাহর রাসুল ﷺ বলেছেন, "যে ব্যক্তি স্বীয় খ্যাতি অর্জনের জন্য ইবাদাত করে, আল্লাহ এর বিনিময়ে খ্যাতি দান করেন। আর যে ব্যক্তি লোক

দেখানোর জন্য ইবাদাত করবে, আল্লাহ এর বিনিময়ে তার প্রকৃত অবস্থা দেখিয়ে দেন।”

হুকুমের দিক থেকে রিয়া তিন প্রকারঃ

প্রথম প্রকারঃ আল্লাহ ব্যতীত অন্যের উদ্দেশ্যে মানুষের আমল করা। এই সকল আমল সে আল্লাহ ব্যতীত অন্যের জন্য করে এবং এ আমল করার উদ্দেশ্যেই হচ্ছে মানুষ ও মানুষকে দেখানো। আর এই প্রকারটি কোন মু'মিনের থেকে প্রকাশ পাওয়াটা চিন্তাও করা যায় না। বরং এটা মুনাফিক্বের কাজ। আল্লাহ তাদের ব্যাপারে বলেন,

﴿ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلا يَذْكُرُونَ اللَّهِ إِلا قَلِيلا ﴾

“তারা লোকদেরকে দেখায় এবং তারা আল্লাহকে অল্পই স্মরণ করে।”[14]

এই প্রকারের হুকুম হল শিরকে আকবার।

দ্বিতীয় প্রকারঃ মানুষ আমল করে এবং সে তার আমলের মাধ্যমে আল্লাহ عَزَّوَجَلَّ এর সন্তুষ্টি ও মানুষের সন্তুষ্টির নিয়ত করে। ফলে সে তার নিয়তে আল্লাহর মাঝে এবং মানুষের মাঝে সমতা বিধান করে। এই প্রকারের হুকুম হল - তা সম্পাদনকারী পাপি ও হুমকির যোগ্য হবে। আর আলেমগণ এ ব্যাপারে ইখতিলাফ করেছেন যে, এই আমল মূল থেকে বাতিল হবে নাকি বাতিল হবে না। তবে সহিহ নছসমূহ প্রমাণ করে যে, তা বাতিল ও বিফল হয়ে যাবে। এ ব্যাপারে সহিহ মুসলিমে আবু হুরায়রাহ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ এর হাদিস প্রমাণ করে যা তিনি নাবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, আল্লাহ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ বলেন, “আমি শরীকদের শিরক থেকে অধিক অমুখাপেক্ষী। যে কেউ এমন আমল করল যাতে আমার সাথে অপরকে শরিক করেছে, আমি তাকে ও তার শিরককে প্রত্যাখ্যান করি।”

আর আমলের সাথে যখন রিয়ার কিছু অংশ মিশ্রিত হবে তখন তা বাতিল হয়ে যাবে। এ ব্যাপারে সালাফগণের পক্ষ থেকে কোন ইখতিলাফ আছে বলে জানা যায় না। যদিও পরবর্তীদের কেউ কেউ এ ব্যাপারে ইখতিলাফ করেছেন। স্পষ্টত পূর্বের দলিল অনুযায়ী আল্লাহ এই আমল বাতিল হওয়ার ব্যাপারে জানিয়ে দিয়েছেন।

তৃতীয় প্রকারঃ মানুষ আল্লাহ عَزَّوَجَلَّ এর জন্য আমল করে এবং সে নিয়তের ভিত্তিতে আমলের সাথে রিয়াকে শরীক করে না। বরং এরপরে হঠাৎ করে রিয়া এসে পড়ে। এই প্রকারের বিধানের ব্যাপারে ব্যাখ্যা রয়েছে। যদি রিয়া অন্তরে হয় এবং তা দূর করে দেয় তাহলে কোন ইখতিলাফ ছাড়াই আমল বিশুদ্ধ হবে। আর যদি এটা তার সাথে দীর্ঘায়িত হয় তাহলে তার আমল কি নষ্ট হয়ে যাবে নাকি যাবে না? আর তার নিয়তের ভিত্তিতেই কি তাকে প্রতিদান দেওয়া হবে? এ ব্যাপারে সালাফ আলেমগণের মাঝে ইখতিলাফ

[14] সুরা নিসা-১৪২

রয়েছে যা ইমাম আহমাদ ও ইবনে জারির আত-ত্বাবারী বর্ণনা করেছেন।[15]

অধিকাংশ ক্ষেত্রে যদি সাধারণ রিয়া হয় তাহলে দ্বিতীয় ও তৃতীয় প্রকারে ফিরে যাবে।

[15] ইবনে রজব হাম্বলী তার কিতাব 'জামিউল উলুম ওয়াল হিকাম' এ বলেন, ইবনে জারীর বলেন, "এই ইখতিলাফ ঐ আমলের ক্ষেত্রে যার শেষাংশ প্রথমাংশের সাথে সম্পর্কযুক্ত। যেমন- সালাত, সিয়াম, হজ্জ। আর যে আমলের প্রথমাংশ শেষাংশের সাথে সম্পর্কযুক্ত নয়। যেমন- ক্বিরাআত, যিকির, সম্পদ খরচ করা এবং ইলমের প্রচার প্রসার। সুতরাং এ ক্ষেত্রে আকস্মিকভাবে উপস্থিত হওয়া রিয়া উদ্দেশ্য বাতিল করে দিবে এবং নিয়ত নবায়ন করা প্রয়োজন হবে।" [মাকতাবাতুল বায়্যিনাতের সংযুক্তি]

লেখক رحمه الله বলেন,

“ইসলাম ভঙ্গের দ্বিতীয় কারণঃ

যে ব্যক্তি তার মাঝে ও আল্লাহর মাঝে মাধ্যমসমূহ নির্ধারণ করে, অথবা তাদেরকে ডাকে, তাদের কাছে শাফাআত কামনা করে এবং তাদের উপর ভরষা করে সে ঐক্যমতে কাফির হয়ে যাবে।”

ব্যাখ্যঃ

এই ভঙ্গের কারণটিতে কুরাইশ মুশরিকরা পতিত হয়েছিল। তারা আল্লাহর সাথে মাধ্যমসমূহ নির্ধারণ করত যেগুলো তাদেরকে আল্লাহর নিকটবর্তী করে দিবে - এর সাথে সাথে তারা আল্লাহর রুবুবিয়্যাতের প্রতি ঈমান আনয়ন করত। তারা স্বীকৃতি দিত যে, আল্লাহ সৃষ্টিকর্তা এবং সৃষ্টি করা, রিযিক্ব দেওয়া, জীবিত করা ও মৃত্যু দেওয়ার ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহর রয়েছে। এসত্ত্বেও তারা মুসলিম মুওয়াহহীদ (তাওহীদবাদী) হতে পারেনি। বরং তারা মুশরিক ছিল। নাবী ﷺ এজন্যই তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করেছেন, তাদের রক্ত হালাল মনে করেছেন এবং তাদের স্ত্রীদের ও সন্তান-সন্ততীদের দাস বানিয়েছেন। তিনি তা’আলা তাদের ব্যাপারে বলেন,

﴿ وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لا يَضُرُّهُمْ وَلا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَٰؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ ﴾

“আর তারা আল্লাহ ছাড়া এমন কিছুর ইবাদাত করে যা তাদের ক্ষতিও করতে পারে না এবং উপকারও করতে পারে না। আর তারা বলে, এগুলো আল্লাহর নিকট আমাদের সুপারিশকারী।”[16]

তিনি তা’আলা বলেন,

﴿ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ ﴾

“আর যারা আল্লাহ ছাড়া অন্যদেরকে অভিভাবক হিসেবে গ্রহণ করে তারা বলে, আমরা কেবল এজন্যই তাদের ইবাদাত করি যে, তারা আমাদেরকে আল্লাহর নিকটবর্তী করে দেবে।”[17]

সুতরাং এই শিরকের মধ্যে পতিত হওয়ার কারণ হল মানুষ তার মাঝে এবং আল্লাহর মাঝে মাধ্যম নির্ধারণ করে। সে মনে করে ঐ মাধ্যম তার প্রয়োজনগুলো আল্লাহর কাছে স্থানান্তরিত করে দেয়। যেমন সে কবরবাসীকে বলে, হে অমুক! আপনি আল্লাহর নিকট আমার জন্য সুপারিশ করুন, হে আল্লাহর রাসুল!

---

[16] সুরা ইউনুস-১৮

[17] সুরা যুমার-৩

আপনি আমার জন্য সুপারিশ করুন। সে তার নিকট শাফাআত চায়। ফলে সে রাসুলকে তার মাঝে এবং আল্লাহর মাঝে মাধ্যম নির্ধারণ করে। এটা শিরক। কারণ তা হল আল্লাহ ব্যতীত অন্যকে এমন বিষয়ের ক্ষেত্রে ডাকা যার ক্ষমতা শুধুমাত্র আল্লাহর রয়েছে।

যে ব্যক্তি আল্লাহ ব্যতীত অন্যকে ডাকে সে মুশরিক হয়ে যায়। এব্যাপারে নছসমূহ (বক্তব্যসমূহ) প্রমাণ করে। যাতে রয়েছে -

﴿ وَلَا تَدْعُ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ ۖ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ ﴾

“আর আপনি আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে ডাকবেন না, যা আপনার উপকারও করে না, অপকারও করে না। কারণ যদি আপনি এটা করেন তখন অবশ্যই যালিমদের অন্তর্ভুক্ত হবেন।”[18]

তিনি سُبْحَانَهُ এর বাণীঃ

﴿ فَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ فَتَكُونَ مِنَ الْمُعَذَّبِينَ ﴾

“অতএব, আপনি আল্লাহর সাথে অন্য কোন ইলাহকে ডাকবেন না, তাহলে আপনি আযাবপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবেন।”[19]

তিনি سُبْحَانَهُ এর বাণীঃ

﴿ وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ ۚ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ ﴾

“আর যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে অন্য ইলাহকে ডাকে, এ বিষয়ে তার নিকট কোন প্রমাণ নেই; তার হিসাব তো তার রবের নিকটই আছে। নিশ্চয় কাফিররা সফলকাম হবে না।”[20] সুতরাং তিনি তাকে কাফির হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন।

এখানে লক্ষণীয় হল এই ভঙ্গের কারণটি প্রথম ভঙ্গের কারণের অন্তর্ভুক্ত। প্রথম ভঙ্গের কারণটি হল আম (ব্যাপক) আর দ্বিতীয়টি হল খাছ। তাহলে লেখক কেন এই ভঙ্গের কারণটিকে এককভাবে উল্লেখ করেছেন।

---

[18] সুরা ইউনুস-১০৬

[19] সুরা শুআরা-২১৩

[20] সুরা মু’মিনুন-১১৭

লেখক কয়েকটি উদ্দেশ্যে তা এককভাবে উল্লেখ করেছেনঃ

- মানুষের মাঝে এটা অধিক সংঘটিত হয়।

- মানুষের একটি বড় অংশ পাওয়া যায় যারা মাধ্যমসমূহ এবং শাফাআতকারী গ্রহণ করাকে এমন শিরক মনে করে না যা মিল্লাহ থেকে বের করে দেয়। তাই লেখক এব্যাপারে সতর্ক করার জন্য এই ভঙ্গের কারণটিকে এককভাবে উল্লেখ করেছেন।

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়্যাহ মাজমুউল ফাতাওয়ায় বলেন, "যদি তোমরা আল্লাহর মাঝে এবং তার সৃষ্টির মাঝে তত্ত্বাবধারকদের ন্যায় মাধ্যম সাব্যস্ত কর যারা বাদশাহ এবং তার প্রজাদের মাঝে থাকে - এইভাবে যে, তারা সৃষ্টির প্রয়োজনগুলো আল্লাহর নিকট উত্থাপন করে..... সুতরাং যে ব্যক্তি তাদেরকে এই ভিত্তিতে মাধ্যম সাব্যস্ত করবে সে কাফির মুশরিক হয়ে যাবে। তাকে তাওবা করতে বলা ওয়াজিব হবে। যদি সে তাওবা না করে তাহলে তাকে হত্যা করা হবে। এরাই হল আল্লাহর জন্য সাদৃশ্য দানকারী। তারা সৃষ্টিকে সৃষ্টিকর্তার সাথে সাদৃশ্য দেয় এবং আল্লাহর জন্য সমকক্ষ নির্ধারণ করে।"[21]

আল্লাহ তা'আলার কিতাবে বর্ণিত আখিরাতে যে শাফাআত হবে তা দুই প্রকারঃ

প্রথমঃ অনুনোমোদিত শাফাআত। আল্লাহ ব্যতীত অন্যের থেকে এমন বিষয়ে চাওয়া যার ক্ষমতা শুধুমাত্র আল্লাহর রয়েছে। আল্লাহ এ শাফাআতকে প্রত্যাখ্যান করেছেন এবং নাকচ করে দিয়েছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿ وَأَنْذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْ يُحْشَرُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ ۙ لَيْسَ لَهُمْ مِنْ دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴾

"আর আপনি এর দ্বারা ঐ সকল লোকদের সতর্ক করুন, যারা ভয় করে যে, তাদেরকে তাদের রবের নিকট সমবেত করা হবে এমন অবস্থায় যে, তিনি ছাড়া তাদের জন্য কোন অভিভাবক বা সুপারিশকারী থাকবে না। যেন তারা তাক্বওয়ার অধিকারী হয়।"[22]

তিনি তা'আলা বলেন,

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفَاعَةٌ ۗ وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴾

"হে মু'মিনগণ! আমরা তোমাদেরকে যে রিযিক্ব দিয়েছি তা থেকে তোমরা ব্যয় কর সেদিন আসার পূর্বে, যেদিন কোন বেচা-কেনা, বন্ধুত্ব ও সুপারিশ থাকবে না, আর কাফিররাই যালিম।"[23]

---

[21] মাজমুউল ফাতাওয়া-১/১২২৬

[22] সুরা আনআম-৫১

[23] সুরা বাকারাহ-২৫৪

﴿ فَمَا لَنَا مِنْ شَافِعِينَ ۝ وَلَا صَدِيقٍ حَمِيمٍ ﴾

"অতএব, আমাদের কোন সুপারিশকারী নেই এবং কোন অন্তরঙ্গ বন্ধুও নেই।"[24]

দ্বিতীয়ঃ অনুমোদিত শাফাআত। তা হল আল্লাহ যে শাফাআতের ব্যাপারে অনুমতি প্রদান করবেন এবং তা এককভাবে আল্লাহর নিকট চাওয়া হয়। আর এই শাফাআত নির্দিষ্টভাবে মু'মিন ও তাওহীদবাদীদের জন্য।

আল্লাহ এটাকে দুই শর্তের আলোকে স্থির করেছেনঃ

প্রথমঃ শাফাআতকারীর শাফাআতের ব্যাপারে আল্লাহর অনুমতি থাকা। তিনি তা'আলা বলেন,

﴿ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلا بِإِذْنِهِ ﴾

"কে আছে এমন, যে তার অনুমতি ব্যতীত তার নিকট সুপারিশ করতে পারে?"[25]

দ্বিতীয়ঃ যার জন্য শাফাআত করা হবে তার ব্যাপারে আল্লাহর সন্তুষ্টি থাকা। তিনি তা'আলা বলেন,

﴿ وَلا يَشْفَعُونَ إِلا لِمَنِ ارْتَضَى ﴾

"আর তারা সুপারিশ করবে শুধু তাদের জন্যই যাদের প্রতি তিনি সন্তুষ্ট।"[26]

তিনি তা'আলা স্পষ্টকরে এই দুই শর্তের কথা বলেছেন,

﴿ وَكَمْ مِنْ مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلا مِنْ بَعْدِ أَنْ يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَرْضَى ﴾

"আর আসমানসমূহে বহু ফিরিশতা রয়েছে, তাদের সুপারিশ কিছুমাত্র ফলপ্রসূ হবে না, তবে ঐ ব্যক্তির ব্যাপারে আল্লাহর অনুমতির পর যার জন্য তিনি ইচ্ছে করেন ও যার প্রতি তিনি সন্তুষ্ট হোন।"[27]

যে ব্যক্তি শাফাআত করবে তার ব্যাপারে কতিপয় আহলুল ইলমগণ এখানে অন্য আরো একটি শর্ত সংযুক্ত করেছেনঃ শাফাআতকারী অধিক লা'নতকারীদের (অভিশাপকারী) অন্তর্ভুক্ত না হওয়া। অর্থাৎ যারা অধিক পরিমাণে লা'নত করে। এটা আবু দারদা رضي الله عنه এর হাদিসে প্রমাণিত হয়েছে যা সহিহ

[24] সুরা শুআরা-১০০-১০১

[25] সুরা বাকারাহ-২৫৫

[26] সুরা আম্বিয়া-২৮

[27] সুরা নাজম-২৬

মুসলিমে বর্ণিত হয়েছেঃ "নিশ্চয়ই অধিক পরিমাণে লা'নতকারীরা ক্বিয়ামাতের দিন সাক্ষী এবং শাফাআতকারী হবে না।"

আর দুনিয়ার সাথে সম্পৃক্ত শাফাআত (সুপারিশ) যা বান্দাগণ দুনিয়াতে তাদের মাঝে করে থাকে, যে ব্যাপারে মানুষের ক্ষমতা রয়েছে এবং যে শাফাআতের (সুপারিশ করার) মাধ্যমে অন্যের উপকার করা ও অনিষ্ট দূর করা যায়।

হুকুমের দিক থেকে এই শাফাআত দুই প্রকারঃ

১. জায়েয

২. নিষিদ্ধ

এই শাফাআত কয়েকটি শর্তের ভিত্তিতে জায়েয। যদি এই শর্তগুলো থেকে একটি শর্ত ছুটে যায় তাহলে তা নিষিদ্ধ হয়ে যাবে।

প্রথমঃ এই শাফাআত বা সুপারিশ বৈধ বিষয়ে হওয়া। তাই একজন ব্যক্তি অন্য ব্যক্তির জন্য কোন হারাম বিষয়ে শাফাআত বা সুপারিশ করতে পারবে না। সুতরাং এটা হারাম জায়েয নয়। আল্লাহ عَزَّوَجَلَّ বলেন,

﴿ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ﴾

"সৎকাজ ও তাক্বওয়ার ব্যাপারে তোমরা পরস্পরকে সহযোগিতা কর এবং পাপ ও সীমালঙ্ঘনের কাজে তোমরা পরস্পরকে সহযোগিতা করো না।"[28]

যেমন কতক লোকের উপর হদ বাস্তবায়ন করা আবশ্যক হয়েছে। তাদের ব্যাপারে হদ প্রমাণিত হওয়ার পর তা বাস্তবায়ন না করার ব্যাপারে শাফাআত বা সুপারিশ করা। এটা নিষেধ এবং জায়েয নেই। যখন উসামা ইবনে যায়েদ ইবনে হারিসা رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ মাখযুমী গোত্রের মহিলার জন্য সুপারিশ করতে চাইলেন তখন রাসুল ﷺ তার সুপারিশ গ্রহণ করেননি। এবং তিনি তাকে বলেছেন, যদি মুহাম্মাদের মেয়ে ফাতিমা চুরি করত তাহলে অবশ্যই আমি তার হাত কর্তন করতাম। তাই প্রথম শর্ত হল - এই সুপারিশ বৈধ বিষয়ে হওয়া এবং কোন হারাম বিষয়ে না হওয়া আবশ্যক।

দ্বিতীয়ঃ এই সুপারিশের মাঝে কোন সীমালঙ্ঘন না থাকা এবং অন্যদের অধিকারসমূহের ক্ষেত্রে কোন বাড়াবাড়ি না থাকা। যেমন - কিছু মানুষ একটি চাকরির দাবিদার। অতঃপর একজন ব্যক্তি এসে এই সকল লোকদের মধ্য থেকে একজনের জন্য সুপারিশ করে তাকে অগ্রগামী করে দিল। অথচ সেখানে এই চাকরির ব্যাপারে এই ব্যক্তির থেকেও উত্তম এবং অধিক যোগ্য লোক রয়েছে। সুতরাং এই ধরনের সুপারিশ জায়েয নয়। কারণ এতে বাড়াবাড়ি, সীমালঙ্ঘন ও অন্য মানুষদের জন্য জুলুম রয়েছে। তাই এই

[28] সুরা মায়িদাহ-০২

ধরনের সুপারিশ বৈধ নয়। বরং তা হারাম। সুতরাং এই দুইটি শর্ত থাকা আবশ্যক যেন এই সুপারিশ শারীয়াহ সম্মত হয়।

এই প্রকার শাফাআতের (সুপারিশ) মাধ্যমে যদি মানুষ আল্লাহর সন্তুষ্টি উদ্দেশ্যে করে তাহলে অবশ্যই তাকে প্রতিদান দেওয়া হবে। যেমন এটা মুআবিয়া ও আবু মুসা আশআরী رضي الله عنهما দের হাদিসে বর্ণিত হয়েছে- রাসুল ﷺ বলেছেন, "তোমরা সুপারিশ কর তাহলে তোমাদেরকে প্রতিদান দেওয়া হবে।" আর আল্লাহ عز وجل তার রাসুলের ভাষায় যা ইচ্ছা করেন তা ফায়সালা দিতেন।

বৈধ সুপারিশের উদাহরণঃ যেমন একজন ব্যক্তি অন্য একজন ব্যক্তির জন্য সুপারিশ করে যে, তাকে যেন ক্ষমা করা হয়, অথবা তাকে যেন সম্পদ দেওয়া হয়, অথবা তাকে যেন বিবাহ করানো হয়...... এরকম সাদৃশ্যপূর্ণ যা আছে। অর্থাৎ এমন বিষয়ে যা বাস্তবায়ন করার ক্ষেত্রে মানুষের প্রশস্ততা রয়েছে।

লেখক رحمه الله বলেন,

“ইসলাম ভঙ্গের তৃতীয় কারণঃ

যে ব্যক্তি মুশরিকদেরকে কাফির সাব্যস্ত করে না অথবা তাদের কুফরিতে সন্দেহ পোষণ করে অথবা তাদের মতবাদকে সঠিক মনে করে সে কাফির হয়ে যাবে।”[29]

ব্যাখ্যঃ

যে ব্যক্তি মুশরিকদের কাফির সাব্যস্ত করে না অথবা তাদের মতবাদকে সঠিক মনে করে এবং তারা যে কুফর ও সীমালঙ্ঘনের মাঝে রয়েছে সেটাকে ভালো মনে করে মুসলিমদের ঐক্যমতে সে কাফির। কারণ সে প্রকৃত ইসলাম চিনতে পারেনি। তা হলঃ “একত্ববাদের মাধ্যমে আল্লাহর জন্য আত্মসমর্পণ করা, আনুগত্যের মাধ্যমে তার অনুগত হওয়া এবং শিরক ও মুশরিকদের থেকে সম্পর্কচ্ছেদ করা।”

আহলে কিতাব, মুশরিক, নাস্তিক, মুরতাদ এবং অন্যান্যদের মধ্য থেকে যাদের কুফরির ব্যাপারে আল্লাহ হুকুম দিয়েছেন তাদের কুফরির কারণে সম্পর্ক ছিন্ন করা ওয়াজিব। এটাই তাওহীদের আবশ্যকীয় বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত।

তাওহীদ দুইটি রুকুনের উপর প্রতিষ্ঠিতঃ

প্রথমঃ তাগুতকে অস্বীকার করা।

দ্বিতীয়ঃ আল্লাহর প্রতি ঈমান আনা।

এটাই কালিমাতুত তাওহীদ (তাওহীদের কালিমা) ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’র অর্থ। সুতরাং এর অর্থ হলঃ প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ ব্যতীত কোন মা’বুদ (যার ইবাদাত করা হয়) নেই।

কালিমার (বাক্যের) প্রথম প্রকার “লা ইলাহা বা কোন ইলাহ নেই” আল্লাহ ব্যতীত অন্যের ইবাদাত যোগ্য হওয়াকে অস্বীকার করা এবং তাগুতকে অস্বীকার করার প্রমাণ করে। আর কালিমার দ্বিতীয় প্রকার “ইল্লাল্লাহ বা আল্লাহ ব্যতীত” এককভাবে আল্লাহর জন্য ইবাদাত সাব্যস্ত হওয়ার প্রমাণ করে।

তিনি তা’আলা এই দুইটি রুকুন স্পষ্টকরে তার কিতাবে বলেন,

﴿ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انْفِصَامَ لَهَا ﴾

“সুতরাং যে ব্যক্তি তাগুতকে অস্বীকার করল এবং আল্লাহর প্রতি ঈমান আনয়ন করল সে মজবুত

---

[29] সম্মানিত শাইখুল মুজাহিদ আবু মালিক আত-তামিমী تقبله الله এর দুইটি দারসে তৃতীয় ভঙ্গের কারণের একটি বিস্তারিত ব্যাখ্যা রয়েছে - যা আনকাবুত নেটওয়ার্ক থেকে প্রকাশিত হয়েছে। [প্রকাশকঃ আত-তুরাছ আল- ইলমী মিডিয়া]

হাতলকে আঁকড়ে ধরল যা বিচ্ছিন্ন হবে না।”[30]

ইবনুল ক্বাইয়্যিম رحمه الله বলেন, “শুধু অস্বীকার করাটাই তাওহীদ নয়। এমনিভাবে শুধুমাত্র সাব্যস্ত করাও নয়। সুতরাং এ দুইয়ের মাঝে একত্রকরণ আবশ্যক। তাই মু'মিনদের সাথে ওয়ালা (সম্পর্ক করা) সম্পন্ন হবে না এবং বিশুদ্ধ হবে না কাফিরদের সাথে শত্রুতা করা ও তাদেরকে ঘৃণা করা ব্যতীত।”

- “তাগুতকে অস্বীকার করা” এর অর্থ হল, আপনি আল্লাহ ব্যতীত অন্যের ইবাদাত করা থেকে মুক্ত থাকবেন, তা প্রত্যাখ্যান করবেন, তা অস্বীকার করবেন, তা ঘৃণা করবেন, তার সাথে শত্রুতা করবেন এবং যারা আল্লাহ ব্যতীত অন্যের ইবাদাত করে তাদের সাথে শত্রুতা করবেন। এটাই হল তাগুতকে অস্বীকার করা, আল্লাহ ব্যতীত প্রত্যেক মা'বুদের (উপাস্যদের) থেকে সম্পর্কচ্ছেদ করা, আল্লাহ ব্যতীত অন্যের জন্য সকল ইবাদাতকে অস্বীকার করা, তা প্রত্যাখ্যান করা, তা ঘৃণা করা, যারা তা করে তাদেরকে ঘৃণা করা এবং তাদের সাথে শত্রুতা করা।

- যখন আপনি এই দুইটি বিষয় সম্পন্ন করবেন তখন আপনি মুওয়াহহীদ, আপনি তাগুতকে অস্বীকার করছেন এবং আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছেন। এটাই হল লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'র অর্থ।

অতএব তাওহীদের ব্যখ্যা হলঃ ইবাদাতের ক্ষেত্রে আল্লাহকে একক সাব্যস্ত করা এবং কুফর ও কাফিরদের থেকে সম্পর্কচ্ছেদ করা।

এই দুইটি রুকুনের মাধ্যমেই মানুষের নফস (জান) ও সম্পদ নিরাপদ হয়। মুসলিম তার সহিহ গ্রন্থে মারওয়ান আল-ফাযারীর সনদে বর্ণনা করেছেন - তিনি আবু মালিক থেকে তিনি তার পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, আমি আল্লাহর রাসুল ﷺ কে বলতে শুনেছি তিনি বলেন, “যে ব্যক্তি বলে আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ নেই এবং আল্লাহ ব্যতীত যার ইবাদাত করা হয় তাকে সে অস্বীকার করে তার সম্পদ ও রক্ত হারাম হয়ে যাবে। আর তার হিসাব আল্লাহর নিকট।”

সুতরাং আল্লাহর প্রতি ঈমান আনার সাথে সাথে আল্লাহ ব্যতীত যার ইবাদাত করা হয় তাকে অস্বীকার করা আবশ্যক। এবং মানুষের রক্তের ও সম্পদের নিরাপত্তা বাস্তবায়ন হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহর প্রতি ঈমান আনার পাশাপাশি আল্লাহ ব্যতীত যার ইবাদাত করা হয় তাকে অস্বীকার করা একত্রিত করা না হয়।

কুফর ও কাফিরদের থেকে ‘বারা’ করা (সম্পর্কচ্ছেদ করা) তিনটি বিষয়ের মাধ্যমে সম্পাদিত হয়ঃ

১. অন্তরের দ্বারা

২. জবানের দ্বারা

৩. অঙ্গপ্রত্যঙ্গের দ্বারা

---

[30] সুরা বাকারাহ-২৫৬

প্রথমঃ কুফর ও কাফিরদের থেকে অন্তরের সম্পর্কচ্ছেদ করা। এর বাস্তবতা হলঃ কুফর ও কাফিরদেরকে অপছন্দ করা, তাদেরকে ঘৃণা করা, তাদের ধ্বংস কামনা করা, কুফর বাতিল হওয়ার ব্যাপারে আক্বীদাহ (বিশ্বাস) পোষণ করা এবং তা বর্জন করা। এটাই হল অন্তরের অস্বীকার করা। এর হুকুম হলঃ আবশ্যকীয় ফরজ। কোন অবস্থাতেই তা বিলুপ্ত হওয়ার চিন্তাও করা যাবে না। কেননা কারো জন্য ঐ জিনিস অপছন্দ করা সম্ভব নয় যা তার অন্তরে একাগ্র হয়।

দ্বিতীয়ঃ জবানের সম্পর্কচ্ছেদ করা। এর বাস্তবতা হলঃ জবানের মাধ্যমে স্পষ্ট ঘোষণা দেওয়া যে, আল্লাহ ব্যতীত অন্যের ইবাদাত করা বাতিল এবং কাফিরদেরকে ঘৃণা করা ও তাদের ইবাদাত বাতিল হওয়ার ব্যাপারে স্পষ্ট ঘোষণা দেওয়া। সুতরাং সে এটা জবানের মাধ্যমে বলবে। এর বিধান হল ওয়াজিব (আবশ্যক)।

জবানের মাধ্যমে স্পষ্ট ঘোষণা দেওয়া কি বিলুপ্ত হবে?

হ্যাঁ, ইকরাহের (বাধ্য করা) এবং সক্ষমতা না থাকার কারণে জবানের মাধ্যমে স্পষ্ট ঘোষণা দেওয়া বিলুপ্ত হবে। আল্লাহ তা'আলার এ বাণীর কারণে,

﴿ لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلا وُسْعَهَا ﴾

“আল্লাহ কারো উপর এমন কোন দায়িত্ব চাপিয়ে দেন না যা তার সাধ্যাতীত।”[31]

আর স্পষ্ট ঘোষণা দেওয়া ওয়াজিব হওয়ার ব্যাপারে দলিল হল- আল্লাহ তা'আলার বাণীঃ

﴿ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ۝ لا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ ﴾

“আপনি বলুন, হে কাফির সম্প্রদায়। তোমরা যার ইবাদাত কর আমি তার ইবাদাত করি না।”[32]

তিনি তা'আলা ইবরাহীম ও তার সাথে যারা ছিল তাদের ব্যাপারে বলেন,

قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَآءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّىٰ تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ ۝

“অবশ্যই তোমাদের জন্য ইবরাহীম ও তার সাথীদের মধ্যে রয়েছে উত্তম আদর্শ। যখন তারা তাদের সম্প্রদায়কে বলেছিল, তোমাদের সঙ্গে এবং তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে যার ইবাদত কর তা হতে আমরা

[31] সুরা বাকারাহ-২৮৬

[32] সুরা কাফিরূন-১-২

সম্পর্কমুক্ত। আমরা তোমাদেরকে অস্বীকার করি এবং তোমাদের ও আমাদের মধ্যে চিরকালের জন্য সৃষ্টি হল শত্রুতা ও বিদ্বেষ, যতক্ষণ না তোমরা এক আল্লাহর প্রতি ঈমান আনয়ন কর।”[33]

এটাই হল হানিফিয়্যাহ মিল্লাতে ইবরাহীমঃ

﴿ وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ ﴾

“ইবরাহীমের ধর্ম থেকে কে মুখ ফিরিয়ে নেয়? তবে সে ব্যতীত, যে নিজেকে বোকা প্রতিপন্ন করে।”[34]

তৃতীয়ঃ অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সম্পর্কচ্ছেদ করা। এর বাস্তবতা হলঃ জিহাদ করা, কুফর ও কাফিরদের দূরীভূত করা এবং তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার মাধ্যমে হবে। আর এটা শক্তিমত্তা ও কল্যাণের সাথে সম্পৃক্ত। এর দলিল জিহাদের প্রত্যেক আয়াতে রয়েছে। অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সম্পর্কচ্ছেদ করার মধ্যে রয়েছে কুফর ও কাফিরদের বর্জন করা, তাদের থেকে বিচ্ছেদ হওয়া এবং তাদের থেকে দূরে থাকার মাধ্যমে।

বিদ'আতিদের বিদ'আত যদি কুফর হয় তাহলে তা সম্পর্কচ্ছেদের এই প্রকারের অধিনে অন্তর্ভুক্ত হবে।

সুতরাং এর উপর ভিত্তি করে যে ব্যক্তি আহলে কিতাবদের অথবা মুশরিকদের তাকফির করে না অথবা তাদের অবস্থা স্পষ্ট হওয়া সত্ত্বেও তাদের কুফরিতে দ্বিধান্বিত থাকে সে আল্লাহ, তার কিতাব এবং তার রাসুল মুহাম্মাদ ﷺ এর প্রতি অবিশ্বাসী কাফির, সকল মানুষের জন্য রাসুলের রিসালাতের ব্যাপকতাকে মিথ্যাপ্রতিপন্নকারী, সকল মুসলিমগণের ঐক্যমতে নাওয়াক্বীদুল ইসলামের (ইসলাম ভঙ্গের কারণসমূহের) মধ্য থেকে একটি ভঙ্গের কারণ সম্পাদনকারী। সুতরাং মুসলিমের জন্য আবশ্যক হচ্ছে তাদের কুফরির ব্যাপারে দৃঢ় সংকল্প থাকা ও বিশ্বাস পোষণ করা।

ক্বাযী ইয়ায 'আশ-শিফা'তে বলেন, “এ জন্যই আমরা ঐ ব্যক্তিকে তাকফির (কাফির সাব্যস্ত) করি, যে মুসলিমদের মিল্লাহ ব্যতীত অন্য মিল্লাহ'র (ধর্ম) প্রতি নতিস্বীকার করে অথবা তাদের ব্যাপারে ইতস্তত করে অথবা সন্দেহ পোষণ করে অথবা তাদের মতকে সঠিক মনে করে। যদিও সে এর সাথে সাথে ইসলাম প্রকাশ করে এবং ইসলাম ব্যতীত অন্য সকল মত বাতিল হিসেবে বিশ্বাস করে। সে এর বিপরীতে যাই প্রকাশ করুক না কেন সে কাফির।”[35]

একটি বিষয়ে সতর্ক করা প্রয়োজনঃ

বর্তমান সময়ে বিশেষকরে মিডিয়ার সকল মাধ্যমগুলোতে পাওয়া যায় - কেউ কেউ দুঃসাহস দেখিয়ে বলে যে, আহলে কিতাব ইহুদী ও খ্রিষ্টানরা আসমানী শারীয়াহ'র অধিকারী, তারা যে বিষয়ের উপর

---

[33] সুরা মুমতাহিনা-৪

[34] সুরা বাকারাহ-১৩০

[35] আশ-শিফা বি-তা'রিফি হুকুক্বিল মুস্তফা-২/১০৭১

রয়েছে সে বিষয়ে তারা মুজতাহিদ। তাই তারাও হক্বের উপর রয়েছে। সুতরাং এই উক্তির প্রবক্তা আল্লাহর সাথে অবিশ্বাসী কাফির এবং তার দ্বীন ত্যাগী।

তার মত আরো কেউ কেউ বলে যে, প্রত্যেক মানুষের জন্য তার ইচ্ছা অনুযায়ী ধর্মপালন করার অধিকার রয়েছে। সুতরাং যে ব্যক্তি ইহুদী ধর্মপালন করতে পছন্দ করবে অথবা খ্রিষ্টান ধর্ম অথবা ইসলাম ধর্মপালন করতে পছন্দ করবে তাহলে সে এ ব্যাপারে পছন্দ করার মত স্বাধীন। কারণ তারা প্রত্যেকেই হক্বের উপর রয়েছে। এটাও কুফর এবং রিদ্দাহ।

এই উক্তিগুলো পূর্বের কতক নাস্তিকদের নিকট পরিচিত। যেমন ইবনে সাবইন, ইবনে হুদ, তিলিমসানী ও অন্যান্যরা বলে, কোন ব্যক্তির জন্য এটা বৈধ যে, সে খ্রিষ্ট ধর্ম ও ইহুদী ধর্ম আঁকড়ে ধরবে যেমন সে ইসলাম ধর্ম আঁকড়ে ধরে। তারা এই আঁকড়ে ধরাকে চার মাজহাবের লোকেরা তাদের মাজহাব আঁকড়ে ধরার মত মনে করে। এবং তারা বলে এগুলোর প্রত্যেকটি এমন পথ যা আল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছে দিবে।

এই ভঙ্গের কারণের সারাংশঃ

আল্লাহ তা'আলাকে অবিশ্বাসী (কাফির) দুই অবস্থা থেকে খালি নয়ঃ

প্রথমঃ সে আসলী কাফির হবে। যেমন ইহুদী, খ্রিষ্টান, বৌদ্ধ ও অন্যান্যরা। এই ব্যক্তির কুফর স্পষ্ট প্রকাশ্য। যে ব্যক্তি তাকে কাফির সাব্যস্ত না করবে অথবা তার কুফরিতে সন্দেহ পোষণ করবে অথবা তার মতবাদকে সঠিক মনে করবে সে কাফির হয়ে যাবে এবং এই কারণেই মিল্লাতে ইসলাম থেকে বের হয়ে যাবে।

দ্বিতীয়ঃ সে মুসলিম হবে অতঃপর সে এমন ভঙ্গের কারণ সম্পাদন করবে যা তাকে ইসলাম থেকে বের করে দিবে। অথচ সে মনে করে তার ইসলামের উপর সে টিকে আছে। যদি সে ইসলাম ভঙ্গের কারণসমূহের মধ্য থেকে সুস্পষ্ট কোন কারণ সম্পাদন করে এবং যে ব্যাপারে ইসলামের ইমামগণের নিকট ইজমা রয়েছে - যেমন যে ব্যক্তি নাবী ﷺ কে নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রুপ করে অথবা তাকে গালি দেয় অথবা এমন কোন বিষয়কে অস্বীকার করে যা দ্বীনে ইসলাম থেকে আবশ্যকীয়ভাবে জানা যায়।

এই ব্যক্তিকে তাকফির করা থেকে বিরত থাকা ব্যক্তি দুই অবস্থা থেকে খালি নয়ঃ

প্রথমঃ সে নাওয়াক্বীদুল ইসলামের (ইসলাম ভঙ্গের কারণসমূহ) মধ্য থেকে যেটাতে পতিত হয় সেটা ইসলাম ভঙ্গের কারণ হওয়ার ব্যাপারে সে অস্বীকার করে। তাহলে তার উপর হুজ্জাত প্রতিষ্ঠা হওয়ার পর তার হুকুম ইসলাম ভঙ্গের কারণ সম্পাদনকারীর মতই হবে।

দ্বিতীয়ঃ নাওয়াক্বীদুল ইসলামের মধ্য থেকে যেটাতে সে পতিত হয় সেটা ইসলাম ভঙ্গের কারণ হওয়ার ব্যাপারে সে স্বীকৃতি দেয় কিন্তু সে তার উপর উজরের উপস্থিতির সম্ভাব্যতার জন্য তাকে তাকফির করা থেকে সতর্ক থাকে। তাহলে তাকে তাকফির করা হবে না।

একটি গুরুত্বপূর্ণ দ্রষ্টব্যঃ এই ভঙ্গের কারণে আমাদের আলোচনা থেকে ঐ সকল মাস'আলাসমূহ বের হয়ে যাবে যেগুলোর ব্যাপারে ইসলামের ইমামগণের নিকট ইখতিলাফ রয়েছে। যেমন সালাত পরিত্যাগ করা, অথবা যাকাত অথবা সিয়াম অথবা হজ্জ পরিত্যাগ করা। সুতরাং এই ভঙ্গের অধিনে যে হুকুমগুলো আমরা বর্ণনা করেছি সেগুলোর আলোকে এই মাস'আলাসমূহ ধরা হবে না।

একটি গুরুত্বপূর্ণ মাস'আলাঃ কাফির যে গুণে গুণান্বিত সে ব্যাপারে কি তার প্রশংসা করা যাবে? যেমন তার ব্যাপারে সত্যবাদীতার প্রশংসা করা অথবা তার ব্যাপারে দানশীলতার প্রশংসা করা অথবা তার ব্যাপারে সাহসিকতার প্রশংসা করা। এই প্রশংসা করা কি তার কুফরকে সঠিক সাব্যস্ত করার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হবে?

এর উত্তর দুই অবস্থা থেকে খালি নয়ঃ

প্রথমঃ তোষামোদি এবং প্রশংসার ক্ষেত্রে অতিরঞ্জন করা ব্যতীত কাফির যে গুণে গুণান্বিত সে ব্যাপারে তার প্রশংসা করাতে কোন সমস্যা নেই। যেমন আমরা হাতিম ইবনে আব্দুল্লাহ আত-ত্বঈর ব্যাপারে দানশীলতার প্রশংসা করি এবং আমরা আনতারাহ ইবনে শাদ্দাদের ব্যাপারে সাহসিকতার প্রশংসা করি অথচ তারা মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত।

দ্বিতীয়ঃ তাদের প্রশংসা করা, তাদের তোষামোদি করা এবং তাদের মতবাদ, কথা ও কর্মসমূহকে সঠিক সাব্যস্ত করা কিছু মানুষকে এমন স্থানে পৌঁছে দেয় যে, -আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাই- তাদেরকে মুসলিমদের উপর প্রাধান্য দেয় এবং তাদেরকে মুসলিমদের থেকে উত্তম মনে করে। সুতরাং এর সবগুলোই রিদ্দাহ। হাদিসে রয়েছে যা দারে কুতনী বর্ণনা করেছেন এবং ইবনে হাজার ও আলবানী হাসান বলেছেন। ইবনে আব্বাসের হাদিস - তিনি বলেন, আবু সুফিয়ান ইসলাম গ্রহণ করার পূর্বে তার সাথে অন্য একজন সাহাবী ছিল। অতঃপর একজন সাহাবী বলল, আবু সুফিয়ান এবং অমুক এসেছে। ফলে রাসুল ﷺ বললেন, "ইসলাম উঁচু থাকবে এবং তার উপর (কোন কিছু) উঁচু থাকবে না। অতঃপর তিনি তাকে মুসলিমদের উপর কাফিরের নাম অগ্রগামী করতে নিষেধ করেছেন।"

আর কাফিরের যে প্রশংসা করার মাঝে সম্মান করা ও মর্যাদা দেওয়ার ধরন থাকে সেটা ওয়ালার (বন্ধুত্ব করার) অন্তর্ভুক্ত হবে এবং রব عَزَّوَجَلَّ কে অসন্তুষ্ট করবে। যেমন বলা হয়, হে সাইয়্যিদ (নেতা) অথবা ইয়া মিস্তার। মিস্তার সাইয়্যিদের স্থলাভিষিক্ত। কারণ আরবি ভাষায় এর অর্থ হল সাইয়্যিদ। নাসাঈতে কাতাদাহ'র হাদিস বর্ণিত হয়েছে তিনি আব্দুল্লাহ ইবনে বুরাইদাহ তিনি তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আল্লাহর রাসুল ﷺ বলেন, "তোমরা মুনাফিককে সাইয়্যিদ (নেতা) বল না। কেননা সে যদি তোমাদের নেতা হয় তাহলে তোমরা তোমাদের রব عَزَّوَجَلَّ কে অসন্তুষ্ট করবে।"

তাই এই বিষয়টি জায়েয নেই। এটা ওয়ালার একটি প্রকার হিসেবে গণ্য করা হয় এবং আলেমগণের মতভেদ অনুযায়ী এটা কবিরাহ গুনাহ অথবা ছোট কুফর হবে।

লেখক رحمه الله বলেন,

“ইসলাম ভঙ্গের চতুর্থ কারণঃ

যে ব্যক্তি এই বিশ্বাস করে, নাবী ﷺ এর হিদায়াত (পথ) থেকে অন্য পথ পূর্ণাঙ্গতর অথবা তার বিধান থেকে অন্য বিধান উত্তম সে সকলের ঐক্যমতে কাফির হয়ে যাবে। যেমন তারা আল্লাহ এবং তার রাসুলের বিধানের উপর তাগুতদের বিধানকে প্রাধান্য দেয়।”

ব্যাখ্যাঃ

কোন সন্দেহ নেই যে, মুহাম্মাদ ﷺ এর হিদায়াত (পথ) সর্বশ্রেষ্ঠতর হিদায়াত। কারণ তা এমন ওহী যা তার নিকট ওহী করা হয়েছে। যেমন আল্লাহ جل وعلا বলেন,

﴿ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ ﴾

“তা কেবলমাত্র ওহী, যা তার প্রতি ওহীরূপে প্রেরণ করা হয়।”[36]

নাবী ﷺ জুমআর খুতবায় বলতেন, “অতঃপর, নিশ্চয়ই সর্বোত্তম কথা হল আল্লাহর কিতাব এবং সর্বোত্তম পথ হল মুহাম্মাদের পথ।”[37]

যে সকল আলেমগণের ইজমা গণ্য করা হয় তারা এ ব্যাপারে ঐক্যমত (ইজমা) হয়েছেন যে, নিশ্চয়ই সুন্নাহ ইসলামী আইন প্রণয়নের মূলনীতিসমূহের দ্বিতীয় মূলনীতি (উসুল) এবং বিধান প্রনয়নের ক্ষেত্রে সুন্নাহ স্বতন্ত্র। তা হালাল করা এবং হারাম করার ক্ষেত্রে কুরআনের মতই।

সুতরাং যে ব্যক্তি বিশ্বাস করবে, এখানে এমন হিদায়াত বা পথ রয়েছে যা নাবী ﷺ এর পথ থেকে শ্রেষ্ঠতর অথবা এখানে এমন বিধান রয়েছে যা তার বিধান থেকে উত্তম তাহলে সে কাফির হয়ে যাবে।

এর দলিল হলঃ সে এই সাক্ষ্য দেয়নি যে, মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসুল। কেননা “মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসুল” সাক্ষ্য দেওয়া তিনি যা আদেশ করেছেন সে বিষয়ে তার আনুগত্য করা, তিনি যা সংবাদ দিয়েছেন সে বিষয়ে তাকে সত্যায়ন করা, তিনি যা থেকে নিষেধ করেছেন ও বারণ করেছেন তা বর্জন করা এবং তিনি যে বিধান দিয়েছেন সে ব্যাপারে শুধুমাত্র আল্লাহর ইবাদাত করাকে দাবি করে।

এমনকি যদি সে বিশ্বাস করে, এখানে এমন হিদায়াত বা পথ রয়েছে যা নাবী ﷺ এর হিদায়াতের (পথের) সমান অথবা সেখানে এমন বিধান রয়েছে যা নাবী ﷺ এর বিধানের অনুরূপ সে কাফির হয়ে যাবে।

---

[36] সুরা নাজম-০৪

[37] মুসলিমে বর্ণিত

এমনিভাবে যদি সে বিশ্বাস করে, নাবী ﷺ এর পথ উত্তম এবং তার বিধান শ্রেষ্ঠতর কিন্তু সে বলে, রাসুলের পথ ব্যতীত অন্য পথ অনুসরণ করা জায়েয এবং রাসুলের বিধান ব্যতীত অন্য বিধানের নিকট বিচার চাওয়া জায়েয তাহলে সেও কাফির হয়ে যাবে।

কিভাবে রাসুল ﷺ এর পথ থেকে অন্য কারো পথ শ্রেষ্ঠতর হতে পারে? অথচ নাবী ﷺ থেকে বর্ণিত হয়েছে তিনি বলেছেন, "ঐ সত্তার কসম যার হাতে আমার জীবন - যদি মুসা তোমাদের মাঝে থাকত অতঃপর তোমরা আমাকে ছেড়ে তাকে অনুসরণ করতে তাহলে অবশ্যই তোমরা দূরবর্তী পথভ্রষ্ট হতে।"

আল্লাহ ﷻ এই উম্মাতের উপর অনুগ্রহ করে তাদের জন্য দ্বীনকে পরিপূর্ণ করে দিয়েছেন এবং তিনি তাদের উপর নি'আমাতকে পরিপূর্ণ করে দিয়েছেন। আর এটা মুহাম্মাদ ﷺ এর মাধ্যমেই হয়েছে।

নাবী ﷺ যে দ্বীন নিয়ে এসেছেন তা হল পরিপূর্ণ দ্বীন যা আল্লাহ তার বান্দাদের জন্য পছন্দ করেছেন। এবং তিনি এটা ছাড়া বান্দাদের থেকে কিছুই গ্রহণ করবেন না।

তিনি তা'আলা বলেন,

﴿ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلاَمَ دِينًا ﴾

"আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পরিপূর্ণ করলাম এবং তোমাদের উপর আমার নি'আমত সম্পূর্ণ করলাম। আর তোমাদের জন্য ইসলামকে দ্বীন হিসেবে পছন্দ করলাম।"[38]

তিনি তা'আলা বলেন,

﴿ إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللّهِ الإِسْلاَمُ ﴾

"নিশ্চয় আল্লাহর নিকট একমাত্র দ্বীন হল ইসলাম।"[39]

তিনি তা'আলা বলেন,

﴿ وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الإِسْلاَمِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴾

"আর যে ব্যক্তি ইসলাম ব্যতীত অন্য কোন দ্বীন তালাশ করে, তার কাছ থেকে তা কখনো গ্রহণ করা হবে না। এবং সে আখিরাতে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে।"[40]

---

[38] সুরা মায়িদাহ-০৩

[39] সুরা আলে ইমরান-১৯

[40] সুরা আলে ইমরান-৮৫

সুতরাং প্রত্যেক এমন ব্যক্তি যে এই দ্বীন ব্যতীত অন্য দ্বীন কামনা করে সে কাফিরদের অন্তর্ভুক্ত।

আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান ব্যতীত বিচার-ফায়সালা করার মাস'আলাঃ

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ﴾

"যারা আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান দিয়ে বিচার-ফায়সালা করে না তারা কাফির।"[41]

তিনি তা'আলা বলেন,

﴿ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ ۚ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ۚ ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴾

"বিধান দেওয়ার ক্ষমতা কেবলই আল্লাহর। তিনি আদেশ করেছেন যে, তোমরা কেবলমাত্র তারই ইবাদাত করবে। এটাই সুদৃঢ় দ্বীন। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ জানে না।"[42]

তিনি তা'আলা বলেন,

﴿ أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ ۚ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ ﴾

"তারা কি জাহিলিয়্যাতের বিধান কামনা করে? আল্লাহ অপেক্ষা বিশ্বাসীদের জন্য উত্তম ফায়সালাকারী কে?"[43]

প্রত্যেক মুসলিম পুরুষ এবং মুসলিম নারীর জন্য এটা জানা উচিৎ যে, আল্লাহ এবং তার রাসুলের বিধান অন্য সকল বিধানের উপর অগ্রগণ্য। সুতরাং মানুষের মাঝে যে বিষয়ই সংঘটিত হোক এর প্রত্যাবর্তনস্থল হল একমাত্র আল্লাহ এবং তার রাসুলের বিধানের নিকট। তাই যে ব্যক্তি আল্লাহ এবং তার রাসুলের বিধান ব্যতীত অন্য বিধানের নিকট বিচার চায় সে কাফির। যেমনটি আল্লাহ তার কিতাবে উল্লেখ করেছেন।

তিনি তা'আলা বলেন,

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَن يَكْفُرُوا بِهِ

[41] সুরা মায়িদাহ-৪৪

[42] সুরা ইউসুফ-৪০

[43] সুরা মায়িদাহ-৫০

وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا ۝

"আপনি কি তাদেরকে দেখেননি, যারা মনে করে, আপনার প্রতি যা অবতীর্ণ করা হয়েছে এবং আপনার পূর্বে যা অবতীর্ণ হয়েছে তারা সে বিষয়ের উপর ঈমান আনে, তারা তাগুতের কাছে বিচার চায় অথচ তাদেরকে আদেশ করা হয়েছে তারা যেন তাকে অস্বীকার করে। পক্ষান্তরে শয়তান তাদেরকে প্রতারিত করে পথভ্রষ্ট করে ফেলতে চায়।"[44]

তিনি جَلَّ وَعَلَا এর এ কথা বলা পর্যন্ত -

﴿ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ﴾

"অতএব, আপনার রবের কসম, ততক্ষণ পর্যন্ত তারা ঈমানদার হবে না, যতক্ষণ না তাদের মধ্যে সৃষ্ট বিবাদের ব্যাপারে আপনাকে ন্যায়বিচারক বলে মনে করে। অতঃপর আপনার মীমাংসার ব্যাপারে তাদের নিজের মনে কোন রকম সংকীর্ণতা পাবে না এবং তা হৃষ্টচিত্তে কবুল করে নেবে।"[45]

আমি স্বয়ং আল্লাহর কসম করে বলছি, তারা মু'মিন হবে না যতক্ষণ না তারা তিনটি বিষয় আঁকড়ে ধরেঃ

১. তারা সকল ক্ষেত্রে রাসুল ﷺ কে বিচারক বানাবে।

২. তিনি যে ফায়সালা দিবেন সে ব্যাপারে তারা তাদের মনে কোন প্রকার সংকীর্ণতা পাবেনা।

৩. তারা তার বিধানের নিকট পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণ করবে।

আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান ব্যতীত বিচার-ফায়সালা করার কিছু চিত্র নিম্নেঃ

- আল্লাহর বিধানের উপর আল্লাহর বিধান ব্যতীত অন্য বিধানকে প্রাধান্য দেওয়া।
- আল্লাহর বিধানের সাথে আল্লাহর বিধান ব্যতীত অন্য বিধানকে সমান করা।
- আল্লাহর আইন ব্যতীত অন্য আইনের নিকট মানুষের বিচার চাওয়াকে বৈধতা দেওয়া।
- মানুষের এমন বিধান চালু করা যার সাথে আল্লাহর বিধান প্রতিদ্বন্দ্বী হয়।
- প্রবৃত্তির কারণে নির্ধারিত কোন ঘটনায় আল্লাহর বিধান ব্যতীত অন্য বিধান দ্বারা বিচার-ফায়সালা

[44] সুরা নিসা-৬০

[45] সুরা নিসা-৬৫

করা যদিও সে বিশ্বাস করে আল্লাহর বিধান অধিক উত্তম।[46]

- এই সুরতগুলোর প্রত্যেকটিই কুফর ও রিদ্দাহ।

আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান ব্যতীত বিচার-ফায়সালা করা কুফর ও রিদ্দাহ।

চাই এ বিশ্বাস করা যে, আল্লাহর বিধান অন্য বিধান থেকে উত্তম অথবা নিম্ন অথবা অনুরূপ তা সমান। এ ব্যাপারে হাফিজ ইমাদুদ্দীন ইবনে কাসির رحمه الله ইজমা বর্ণনা করেছেন। যেমন তিনি 'আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া'তে তাতারদের ঘটনা উল্লেখ করার সময় তা বর্ণনা করেছেন। তারা (তাতাররা) ইয়াসীক্ব দ্বারা বিচার-ফায়সালা করত। এই ইয়াসীক্ব ছিল বিভিন্ন শারীয়াহ'র (আইনের) সমষ্টি। তিনি আহলুল ইলমগণের ইজমা বর্ণনা করেছেন যে, তা আল্লাহর সাথে কুফরি এবং মিল্লাতে ইসলাম থেকে বের করে দেয়।

আর ইবনে আব্বাস رضي الله عنهما থেকে কুফর দুনা কুফর (ছোট কুফর) সম্পর্কে যে কথা বর্ণনা হয়েছে তা তার থেকে প্রমাণিত নয়। হাকিম তার মুস্তাদরেকে হিশাম ইবনে হুজাইরের সনদে তা বর্ণনা করেছেন - তিনি (হিশাম) ত্বউস থেকে, তিনি ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণনা করেন। আহমাদ হিশামকে দুর্বল আখ্যায়িত করেছেন। এবং ইবনে মঈন তাকে অত্যন্ত দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন। ইবনে উআইনা বলেন, আমরা হিশাম ইবনে হুজাইর থেকে গ্রহণ করিনা যতক্ষণ না তা অন্য কারো নিকট পাই। আবু হাতিম বলেন, তার হাদিস লেখা হয় এবং উক্বাইলী তাকে দুর্বলদের মধ্যে উল্লেখ করেছেন।

এব্যাপারে ভিন্নতাও রয়েছে। যা আব্দুর রায্যাক তার তাফসীরে মা'মার থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি ইবনে ত্বউস থেকে তিনি তার পিতা থেকে, তিনি বলেন, ইবনে আব্বাসকে আল্লাহ তা'আলার এ বাণীর ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা হয় -

﴿ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ﴾

"যারা আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান দিয়ে বিচার-ফায়সালা করে না তারা কাফির।"[47]

তিনি বলেন, তার সাথে কুফর রয়েছে। এটাই ইবনে আব্বাস থেকে সংরক্ষিত। অর্থাৎ আয়াতটি মুত্বলাক্ব। আর আয়াতের ব্যাপকতা প্রমাণ করে যে, কুফর দ্বারা উদ্দেশ্য হল বড় কুফর। কারণ কিভাবে এমন ব্যক্তির ব্যাপারে ইসলাম বলা হবে যে শারীয়াহ'কে সরিয়ে দেয় এবং তার বিনিময়ে ইহুদী, খ্রিষ্টান ও

---

[46] শাইখ حفظه الله এতে উদ্দেশ্য করেন,যখন সে পরিবর্তন করা ও আইন প্রণয়ন করার রূপে বিচার-ফায়সালা করবে - আল্লাহ ভালো জানেন- কেননা কোন ঘটনার ক্ষেত্রে প্রবৃত্তি অথবা লোভ অথবা ঘুষের জন্য আল্লাহর বিধান ব্যতীত বিচার-ফায়সালা করা অধিকাংশ আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআহ'র নিকট মিল্লাহ থেকে বের করে দেয় এমন কুফর নয়। যতক্ষণ না সে পরিবর্তন এবং আইন প্রণয়ন না করে। [শাইখ তুর্কী আল-বান'আলী حفظه الله এর সংযুক্তি]

[47] সুরা মায়িদাহ-৪৪

তাদের অনুসারীদের মতামতকে গ্রহণ করে। সুতরাং এটা নাযিলকৃত বিধানকে পরিবর্তন করার সাথে সাথে পবিত্র শারীয়াহ্ থেকে বিমুখ হওয়া। আর তা স্বতন্ত্র আরেক কুফর।

লেখক رَحِمَهُ ٱللَّٰهُ বলেন,

“ইসলাম ভঙ্গের পঞ্চম কারণঃ

রাসুল ﷺ যা নিয়ে এসেছেন তার কোন বিষয়কে যে ব্যক্তি ঘৃণা করবে -যদিও সে এর উপর আমল করে- সে কাফির হয়ে যাবে।”

ব্যাখ্যাঃ

নাবী ﷺ যে হিদায়াত ও বিধান নিয়ে এসেছেন তার কোন অংশকে যে ব্যক্তি অপছন্দ এবং ঘৃণা করে সে আল্লাহ তা'আলার সাথে কুফরি করে - হোক তা কথা অথবা কাজ তা সমান। এটা মুনাফিকদের বৈশিষ্ট্যসমূহের অন্তর্ভুক্ত - বিশ্বাসগত বড় নিফাক্ব যা এর সম্পাদনকারীকে ইসলাম থেকে বের করে দেয় এবং এর সম্পাদনকারী জাহান্নামের সর্বনিম্ন স্তরে অবস্থান করবে। এই ভঙ্গের কারণটি বর্তমান যুগের অনেক মুনাফিকদের মাঝে বিদ্যমান - যেমন ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী, উদারপন্থী এবং পশ্চিমারা যার উপর রয়েছে সে বিষয়ে ধোঁকা খেয়ে যারা তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে। তারা আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান অনুযায়ী বিচার-ফায়সালা করাকে অপছন্দ করে। যেমন চোরের হদ, মদপানকারীকে বেত্রাঘাত করা, ইচ্ছাকৃত হত্যাকারীকে হত্যা করা এবং নারীর দিয়ত পুরুষের দিয়তের অর্ধেক। তাই আল্লাহর রাসুল ﷺ আল্লাহর পক্ষ থেকে যা নিয়ে এসেছেন সে বিষয়কে তারা অপছন্দকারী, কাফির, মিল্লাতে ইসলাম থেকে বের হয়ে গেছে।

আল্লাহর শারীয়াহ'র যে বিষয়কে তাদের কেউ অপছন্দ করে যদি সে ঐ বিষয়ের উপর আমল করে তাহলেও এটা তার কোন উপকার করবে না। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ فَتَعْسًا لَّهُمْ وَأَضَلَّ أَعْمَٰلَهُمْ ۝ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا۟ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَٰلَهُمْ ﴾

“আর যারা কাফির তাদের জন্য রয়েছে ধ্বংস এবং তিনি তাদের সকল আমল বিনষ্ট করে দিবেন। এটা এজন্য যে, আল্লাহ যা নাযিল করেছেন, তারা তা অপছন্দ করে। ফলে আল্লাহ তাদের কর্ম নিস্ফল করে দিবেন।”[48]

সুতরাং আল্লাহ তার কথার মাধ্যমে তাদেরকে কাফির আখ্যায়িত করেছেন - “আর যারা কাফির” এ কারণে যে, তারা “আল্লাহ যা নাযিল করেছেন তারা তা অপছন্দ করে।” বিষয়টি কুফরি হওয়ার কারণে কোন ভাল আমল তার সাথে অবশিষ্ট থাকবে না। কেননা তিনি সম্পূর্ণরূপে তা বিনষ্ট করে দিবেন। তিনি বলেন,“তিনি তাদের কর্ম নিস্ফল করে দিবেন।”

---

[48] সুরা মুহাম্মাদ ৮-৯

এই মাস'আলায় আমরা "অপছন্দ" সম্পর্কে আলোচনা করব তা কয়েক প্রকারঃ

প্রথমঃ এমন অপছন্দ যা স্বয়ং বিধানের ভিত্তির উপর সংঘটিত হয় না - যে মূলনীতি ও বিধান আমাদের নাবী মুহাম্মাদ ﷺ নিয়ে এসেছেন। তা হল সৃষ্টিগত স্বভাবজাত অপছন্দ যা মানুষের ইচ্ছার বহির্ভূত সংঘটিত হয়। যেমন স্ত্রী তার স্বামী অধিক বিবাহ করুক তা অপছন্দ করা। যেমন জান ও মাল হারানোর ভয়ে মু'মিনদের ক্বিতাল (যুদ্ধ) কে অপছন্দ করা। তিনি তা'আলা বলেন,

﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ ﴾

"তোমাদের উপর ক্বিতাল (যুদ্ধ) কে ফরজ করা হয়েছে অথচ তা তোমাদের জন্য অপছন্দনীয়।"[49]

তোমাদের জন্য অপছন্দ অর্থাৎ তোমাদের উপর কঠিন ও কষ্টসাধ্য। কেননা মুজাহিদ সফরের কষ্ট এবং শত্রুদের যুদ্ধের কারণে হয়তো নিহত হয় অথবা আহত হয়।

এমনিভাবে শীতের দিনে ওযুকারীর ওযু করতে অপছন্দ করা। তিনি ﷺ বলেছেন, "এবং অসুবিধা ও কষ্ট সত্ত্বেও পরিপূর্ণরূপে ওযু করা।"

এটা একটি স্বভাবগত বিষয় যার ক্ষমতা বান্দার নেই। সুতরাং স্ত্রীর অপছন্দ স্বয়ং বিধানের উপর এবং ইসলামে আম বিধানের উপর আরোপিত হয় না। তার স্বামী আরো একটি বিবাহ করুক সে শুধুমাত্র তা অপছন্দ করে। কারণ অধিকাংশ নারীরা তাদের স্বামীদের মাঝে অন্য কারো অংশীদার হওয়াকে মেনে নেয় না।

যোদ্ধা ক্বিতাল (লড়াই) কে অপছন্দ করে। কারণ নফস (আত্মা) কে এর উপরেই সৃষ্টি করা হয়েছে - যেমন জীবনকে ভালবাসা এবং মৃত্যুকে অপছন্দ করা। কিন্তু সে ইসলামে ক্বিতালের মর্যাদাকে স্বীকৃতি দেয়। এটা হল স্বভাবগত অপছন্দ। এর কারণে মানুষকে পাকড়াও করা হবে না। আর এই অপছন্দ করাটা এই ভঙ্গের কারণে আমাদের আলোচনার স্থান নয়।

দ্বিতীয়ঃ এমন অপছন্দ অথবা ঘৃণা যা স্বয়ং বিধানের ভিত্তির উপর সংঘটিত হয়। এই বিধান প্রজ্ঞা ও সঠিকতার বিরোধী। যেমন যে ব্যক্তি সালাতের বিধানকে ঘৃণা করে অথবা যাকাতের বিধান অথবা সিয়ামের বিধান অথবা হজ্জের বিধান অথবা একাধিক বিবাহের বিধানকে ঘৃণা করে অথবা এগুলো অপছন্দ করে। যে ব্যক্তির থেকে বিধানের প্রতি ঘৃণা এবং অপছন্দ করা পাওয়া যাবে সেই ব্যক্তির কুফর ও রিদ্দাহ'র ব্যাপারে ঐক্যমত বর্ণিত হয়েছে। আল-ইক্বনা'র লেখক হাজ্জাওয়ী যেমনটি উল্লেখ করেছেন। আর যেমন আল্লাহ ﷻ সংবাদ দিয়েছেন যে, তিনি ঐ ব্যক্তির আমলসমূহ বিনষ্ট করে দিবেন যে ব্যক্তি আল্লাহর প্রণয়নকৃত বিধানকে অপছন্দ করে। আর এখানে অপছন্দ দ্বারা উদ্দেশ্য হল- এমন অপছন্দ যাতে ঐ বিধানকে প্রত্যাখ্যান করার সংশ্লিষ্টতা থাকে। এমনিভাবে এটাও থাকে - এই বিশ্বাস করা যে, তাতে

[49] সুরা বাকারাহ-২১৬

সঠিক পথ নেই, তাতে হক্ব নেই, তাতে সঠিকতা নেই এবং তাতে সফলতা ও কল্যাণ নেই। সুতরাং এই প্রকারই হল আমাদের আলোচনার কেন্দ্র। আর এর হুকুম হল কুফর ও রিদ্দাহ।

একটি গুরুত্বপূর্ণ সতর্কীকরণঃ

অনেক মানুষের নিকট কোন অসৎ কাজ বর্ণনা করা হয়। অতঃপর সে মেনে নিতে অস্বীকৃতি জানায় এবং আপনি যা বলেছেন তা গ্রহণ করে না। বিশেষকরে অসৎ কাজ সম্পাদন করার সময়। কোন বিস্তারিত ব্যাখ্যা ছাড়া এটাকে রাসুল যা নিয়ে এসেছেন তা অপছন্দকারী হিসেবে তাকে বলা হবে না। কারণ আপনি যে হক্ব বর্ণনা করছেন সে তা গ্রহণ করছে না। একারণে নয় যে, তা হক্ব। বরং সৎ কাজের আদেশ এবং অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করার ক্ষেত্রে আপনার মন্দ আচারণের জন্য। যদি আপনার পরিবর্তে অন্য কেউ তার নিকট এসে একই সৎ কাজ তার কাছে বর্ণনা করে তাহলে সে গ্রহণ করবে এবং অনুগত হবে। অথবা সে আপনার থেকে গ্রহণ করছে না - কারণ আপনার মাঝে এবং তার মাঝে কোন ঝামেলা রয়েছে। সুতরাং এই ব্যক্তিকে রাসুল যা নিয়ে এসেছেন তা অপছন্দকারী হিসেবে আখ্যায়িত করা হবে না।

এখানে মানুষের মাঝে এমন রয়েছে - কেউ কেউ পাপ সম্পাদনকারীকে এমন বিষয় চাপিয়ে দেয় যার সাথে সে সংশ্লিষ্ট হয় না। সে দাড়ি মুণ্ডনকারী, টাখনুর নিচে কাপড় পরিধানকারী, মদপানকারী ও অন্যান্যগুলোকে রাসুল ﷺ যা নিয়ে এসেছেন সে বিষয়ের প্রতি 'ঘৃণার সাথে' আরোপ করে দেয়। যেমন দাড়ি ছেড়ে দেওয়ার ব্যাপারে, টাখনুর নিচে কাপড় পরিধান না করার ব্যাপারে আদেশ করা এবং মদপান করা থেকে নিষেধ করা। ফলে সে তাদের বলে, মুহাম্মাদ ﷺ যা নিয়ে এসেছেন সে বিষয়কে যদি তোমরা ঘৃণা না করতে তাহলে তোমরা এই সকল অসৎ কাজ করতে না - এটা একটা বাতিল অভিযোগ। কতক সাহাবীদের থেকে কিছু বিরোধী কাজ পাওয়া গিয়েছিল - যেমন মদপান - কোন সাহাবী তাকে এই অভিযোগ আরোপ করেনি। এমনকি যখন মদপানকারীকে নাবী ﷺ এর নিকট নিয়ে আসা হল তখন কিছু সাহাবী তাকে লা'নত দিচ্ছিল। এবং তিনি বলেন, নেশাগ্রস্থ অবস্থায় তাকে কতবার যে আনা হল! তখন নাবী ﷺ তাকে লা'নত করা থেকে নিষেধ করলেন। এবং তিনি বললেন, "সে আল্লাহ এবং তার রাসুলকে ভালবাসে।"[50]

এই সকল লোকদের অভিযোগ কবিরাহ গুনাহকারীদের ইসলাম থেকে বের করে দেওয়ার দাবি করে। আর এটা আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআহ'র আক্বীদাহ'র বিপরীত - তা হল কবিরাহ গুনাহকারীরা আল্লাহর ইচ্ছার অধিন। যদি আল্লাহ ইচ্ছা করেন তাহলে তিনি তাদের ক্ষমা করে দিবেন। আর যদি তিনি ইচ্ছা করেন তাহলে তিনি তাদের পাপ অনুযায়ী তাদের শাস্তি দিবেন। অতঃপর তাদের আবাসস্থল জান্নাত।

[50] বুখারী

লেখক رَحِمَهُ ٱللَّٰهُ বলেন,

“ইসলাম ভঙ্গের ষষ্ঠ কারণঃ

রাসুল ﷺ এর দ্বীনের কোন বিষয় অথবা এর প্রতিদান অথবা এর শাস্তি নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করা কুফরি। দলিল হল আল্লাহ তা’আলার বাণীঃ

وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ ۚ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ ۝ لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ ۚ إِنْ نَعْفُ عَنْ طَائِفَةٍ مِنْكُمْ نُعَذِّبْ طَائِفَةً بِأَنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ ۝

“আর যদি আপনি তাদেরকে জিজ্ঞাসা করেন, অবশ্যই তারা বলবে, আমরা আলাপচারিতা ও খেল-তামাশা করছিলাম। বলুন, আল্লাহ, তার আয়াতসমূহ ও তার রাসুলের সাথে কি তোমরা বিদ্রূপ করছিলে? তোমরা ওজর পেশ করো না। তোমরা তো ঈমান আনার পর কুফরী করেছো। আমরা তোমাদের মধ্যে কোন দলকে ক্ষমা করলেও অন্য দলকে শাস্তি দেব, কারণ তারা অপরাধী।”[51]

ব্যাখ্যাঃ

এই ভঙ্গের কারণকে সবচেয়ে বিপজ্জনক ভঙ্গের কারণ হিসেবে গণ্য করা হয়। যে ব্যাপারে অনেক মানুষ নমনীয় আচরণ করে। এমনকি তাদের কেউ কেউ দ্বীনের কিছু নিদর্শনকে উপহাস ও বিদ্রূপের পাত্রে পরিণত করে - আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাই - আল্লাহ ঐ ব্যক্তিকে লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তির হুমকি দিয়েছেন যে তার আয়াতসমূহ (নিদর্শন) কে উপহাস ও খেলতামাশারূপে গ্রহণ করে। তিনি বলেন,

﴿ وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آيَاتِنَا شَيْئًا اتَّخَذَهَا هُزُوًا ۚ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ ﴾

“আর যখন সে আমার আয়াতসমূহের কিছু জানতে পারে, তখন সে এটাকে উপহাসের ছলে গ্রহণ করে। এদের জন্য রয়েছে লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি।”[52]

হুকুমের দিক থেকে “উপহাসমূলক কথা” তিন অবস্থা থেকে খালি নয়ঃ

প্রথমঃ প্রকৃত উপহাস করার জন্য বিশ্বাসগত দিক থেকে উপহাসমূলক কথা বলা। এটা কুফর ও রিদ্দাহ।

[51] সুরা তাওবা ৬৫-৬৬

[52] সুরা জাছিয়া-০৯

দ্বিতীয়ঃ বলার উদ্দেশ্যে বিশ্বাস না করে উপহাসমূলক কথা বলা। এটা কুফর ও রিদ্দাহ। এর উদাহরণ হল তাওবার যে আয়াত নাযিল হয়েছে।

কুফরের দিক থেকে দ্বিতীয়টির চেয়ে প্রথমটি অধিক শক্তিশালী। কেননা সে তার কথা ও বিশ্বাসের মাধ্যমে কুফরি করেছে।

তৃতীয়ঃ জিহ্বা অগ্রবর্তী হয়ে যাওয়া এবং উদ্দেশ্য না থাকা। জিহ্বা অগ্রবর্তী হয়ে যাওয়া এই ভঙ্গের কারণের অন্তর্ভুক্ত নয়।

জিহ্বা অগ্রবর্তী হয়ে যাওয়া ঐ ব্যক্তির ন্যায় যে একটি কথা বলার ইচ্ছা করে কিন্তু তার জিহ্বা অন্য আরেক কথা অতিক্রম করে ফেলে। যেমন বুখারি ও মুসলিমে এসেছে যখন লোকটি তার বাহন পাওয়ার আনন্দে বলল, হে আল্লাহ আপনি আমার বান্দা এবং আমি আপনার রব। সে অধিক আনন্দের কারণে ভুল করেছে। ফলে একারণে তাকে পাকড়াও করা হয়নি। কেননা সে এই কথা বলার উদ্দেশ্য করেনি। বরং তার জিহ্বা অগ্রবর্তী হয়েছে।

আর যে ব্যক্তির থেকে জিহ্বা অগ্রবর্তী হয়ে যাওয়া ছাড়া উপহাসমূলক কথা প্রকাশ পাবে সেই কথা কুফরি কথা হবে - তা বিশ্বাসগত দিক থেকে ইচ্ছাকৃত হোক অথবা না হোক তা সমান। তিনি তা’আলা বলেন,

وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ ۚ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ ﴿٦٥﴾ لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ ۚ إِنْ نَعْفُ عَنْ طَائِفَةٍ مِنْكُمْ نُعَذِّبْ طَائِفَةً بِأَنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ ﴿٦٦﴾

“আর যদি আপনি তাদেরকে জিজ্ঞাসা করেন, অবশ্যই তারা বলবে, আমরা আলাপচারিতা ও খেল-তামাশা করছিলাম। বলুন, আল্লাহ, তার আয়াতসমূহ ও তার রাসুলের সাথে কি তোমরা বিদ্রূপ করছিলে? তোমরা ওজর পেশ করো না। তোমরা তো ঈমান আনার পর কুফরী করেছো। আমরা তোমাদের মধ্যে কোন দলকে ক্ষমা করলেও অন্য দলকে শাস্তি দেব, কারণ তারা অপরাধী।”[53]

এই আয়াত মুনাফিক সম্প্রদায়ের ব্যাপারে নাযিল হয়েছে - তারা রাসুল ﷺ এবং তার সাহাবীগণকে নিয়ে উপহাস করেছিল। ফলে আল্লাহ তাদেরকে কুফরের হুকুম দিয়েছেন। ইবনে জারির এবং অন্যরা হিশাম ইবনে সা’দের হাদিস বর্ণনা করেন, তিনি যায়েদ ইবনে আসলাম থেকে, তিনি আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, এক ব্যক্তি তাবুক যুদ্ধের এক মজলিসে বলল, আমরা আমাদের এই কারীদের মত অধিক পেটুক, অধিক মিথ্যাবাদী ও শত্রুদের সাথে সাক্ষাতের সময় অধিক কাপুরুষ আর দেখিনি। তখন মজলিসে উপস্থিত আরেক ব্যক্তি বলল, তুমি মিথ্যা বলেছ, তুমি মুনাফিক, আমি অবশ্যই রাসুলুল্লাহ কে ﷺ তা জানাব। অতঃপর যখন এটা রাসুলুল্লাহ ﷺ এর নিকট পৌঁছালো তখন কুরআন নাযিল হয়েছে। আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর বলেন, তখন আমি ঐ মুনাফিক লোকটিকে দেখতে পেলাম যে, সে রাসুলুল্লাহ ﷺ

[53] সুরা তাওবা ৬৫-৬৬

এর উষ্ট্রীর পেছনের দিকে ঝুলে ছিল, পাথর তার উপর ছিটে এসে পড়ছিল। আর সে বলছিল, আমরা তো কেবল আলাপ-আলোচনা ও খেল-তামাশা করছিলাম। তখন রাসুল ﷺ তাকে বলছিলেন,

﴿ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ ۝ لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُم بَعْدَ إِيمَانِكُمْ ﴾

"বলুন, আল্লাহ, তার আয়াতসমূহ ও তার রাসুলের সাথে কি তোমরা বিদ্রূপ করছিলে? তোমরা ওজর পেশ করো না। তোমরা তো ঈমান আনার পর কুফরী করেছো।"[54]

উপহাস করা বা ঠাট্টা করা দুই প্রকারঃ

প্রথমঃ স্পষ্ট উপহাস করা। যেমন- যে ব্যাপারে আয়াত নাযিল হয়েছে এবং তাদের আলোচনা ও কথা পূর্বে করা হয়েছে "আমরা আমাদের এই কারীদের মত অধিক পেটুক, অধিক মিথ্যাবাদী ও শত্রুদের সাথে সাক্ষাতের সময় অধিক কাপুরুষ আর দেখিনি।"

দ্বিতীয়ঃ অস্পষ্ট উপহাস করা। তা নাড়াচাড়ার মাধ্যমে হয়ে থাকে। যেমন- আল্লাহর কিতাব অথবা তার রাসুল ﷺ এর সুন্নাহ পাঠ করার সময় অথবা আল্লাহর নিদর্শনসমূহের নিকট হাত দ্বারা কটাক্ষ করা এবং কথা প্রকাশ করা। এই প্রকারটি স্বাধীন যার কোন কিনারা নেই।

আল্লাহ এবং নাবী ﷺ কে গালি দেওয়ার বিধানঃ

আল্লাহ এবং নাবী ﷺ কে গালি দেওয়া সকল মুসলিমদের ঐক্যমতে কুফর। এব্যাপারে বিশিষ্ট ব্যক্তিদের একদল ইজমা বর্ণনা করেছেন - যেমন ইসহাক্ব ইবনে রাহাওয়ীহ, মুহাম্মাদ ইবনে সাহনুন, ইবনে আব্দুল বার, কাযী ইয়াজ, সুবুকী, ইবনে তাইমিয়্যাহ এবং এছাড়া অন্যান্যরা।

ইমাম ইবনে ক্বুদামা বলেন, "যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলাকে গালি দিবে সে কাফির হয়ে যাবে। সে মজাকারী হোক অথবা আন্তরিক হোক তা সমান। এমনিভাবে প্রত্যেক এমন ব্যক্তিও কাফির যে আল্লাহ তা'আলাকে নিয়ে অথবা তার নিদর্শনসমূহকে নিয়ে অথবা তার রাসুলগণকে নিয়ে অথবা তার কিতাবসমূহকে নিয়ে উপহাস করে বা ঠাট্টা করে।

সাহাবীগণকে গালি দেওয়া এবং তাদের নিয়ে উপহাস করার হুকুমঃ

সাহাবীগণকে নিয়ে উপহাস করা এবং গালি দেওয়ার কয়েকটি ধরন রয়েছেঃ

তার মধ্য থেকে হলঃ ঐক্যমতের ভিত্তিতে তা কুফর ও রিদ্দাহ। যেমন ব্যাপকভাবে তাদেরকে উপহাস করা, অথবা সামগ্রিকভাবে তাদেরকে গালি দেওয়া অথবা তাদেরকে নিফাক্ব অথবা রিদ্দাহ'র অপবাদ দেওয়া এবং সামান্য পরিমাণ ব্যতীত এটা তাদের উপর ব্যাপকভাবে করা। যে ব্যক্তি এই কাজ করবে তার কুফরির ব্যাপারে আলেমগণের একদল ইজমা বর্ণনা করেছেন - যেমন ইবনে হাযম আল-আন্দালুসী,

---

[54] সুরা তাওবা ৬৫-৬৬

কাযী আবু ইয়ালা, সামআনী, ইবনে তাইমিয়্যাহ, ইবনে কাসির এবং এছাড়া অন্যান্যরা।

কেননা এই কার্যসম্পাদনকারী তার গালি ও উপহাস করার মাধ্যমে তাদের ব্যক্তিকে উদ্দেশ্য করে না। বরং সে তাদের দ্বীন এবং তাদের সাহচর্য উদ্দেশ্য করে। যেহেতু সে এটা তাদের উপর ব্যাপকভাবে করেছে। আর তারা চরিত্র ও আকৃতিতে ব্যবধানসম্বলিত।

যে ব্যক্তি তাদের একজনের ব্যাপারে পতিত হবে - যেমন সে তাকে তার দ্বীন ও তার সাহচর্যের কারণে গালি দিয়েছে অথবা উপহাস করেছে তার আকৃতি, তার চরিত্র ও তার গঠনের কারণে নয় - সে কাফির হয়ে যাবে।

তার মধ্য থেকে আরো একটি হলঃ তা কুফর নয়। কিন্তু এই উপহাসকারী পাপ, তিরস্কার ও ধমকের উপযুক্ত হবে। যেমন তাদের অল্পসংখ্যককে নিয়ে উপহাস করা, তাদের কাউকে কাপুরুষতার অথবা কৃপণতার অথবা স্বল্প ইলমের অথবা এরকম কিছুর অপবাদ দেওয়া।

আহলুল ইলম এবং সৎ ব্যক্তিদের নিয়ে উপহাস করা দুই প্রকারঃ

প্রথমঃ তাদের ব্যক্তিগত কারণে বিদ্রূপ করা ও উপহাস করা। যেমন তাদের ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য নিয়ে অথবা চরিত্র নিয়ে উপহাস করা। এই প্রকারটি আল্লাহ তা'আলার এ বাণীর কারণে হারামঃ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَىٰ أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ عَسَىٰ أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ ۖ وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ ۖ

“হে ঈমানদারগণ, কোন সম্প্রদায় যেন অপর কোন সম্প্রদায়কে বিদ্রূপ না করে, হতে পারে তারা বিদ্রূপকারীদের চেয়ে উত্তম। আর কোন নারীও যেন অন্য নারীকে বিদ্রূপ না করে, হতে পারে তারা বিদ্রূপকারীদের চেয়ে উত্তম। আর তোমরা একে অপরের নিন্দা করো না এবং তোমরা একে অপরকে মন্দ উপনামে ডেকো না।”[55]

দ্বিতীয়ঃ সৎ ব্যক্তিদেরকে তাদের সততার কারণে, আহলুল ইলমগণকে তাদের ইলমের কারণে এবং মুজাহিদদেরকে তাদের জিহাদের কারণে বিদ্রূপ করা ও উপহাস করা। এই প্রকারটি কুফর এবং মিল্লাহ থেকে বের করে দেয় এমন রিদ্দাহ। কারণ এর মাধ্যমে উদ্দেশ্য হচ্ছে আল্লাহর দ্বীন নিয়ে উপহাস করা যা তারা বহন করছে। সুতরাং উপহাসটা তাদের ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্যের উপরে পতিত হবে না। তা তাদের সততা, তাদের ইলম ও তাদের জিহাদের উপর সংঘটিত হবে।

দ্বীন নিয়ে উপহাস করা অধিক বিপজ্জনক হওয়ার কারণে আল্লাহ উপহাসকারীদের সাথে বসা থেকে সতর্ক করেছেন।

[55] সুরা হুজুরাত-১১

তিনি তা'আলা বলেন,

قَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّىٰ يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ ۚ إِنَّكُمْ إِذًا مِّثْلُهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا ﴿١٤٠﴾

"তিনি কিতাবে তোমাদের প্রতি নাযিল করেছেন যে, যখন তোমরা শুনবে, আল্লাহর আয়াতকে অস্বীকার করা হচ্ছে এবং তা নিয়ে বিদ্রুপ করা হচ্ছে, তখন তোমরা তাদের সাথে বসো না, যতক্ষণ না তারা অন্য প্রসঙ্গে লিপ্ত হয়, নয়তো তোমরাও তাদের মত হবে। মুনাফিক এবং কাফির সবাইকে আল্লাহ জাহান্নামে একত্র করবেন।"[56]

উপহাস করা ভয়াবহতা হওয়ার কারণে ঐ ব্যক্তির হুকুম কি হবে যে উপহাসের মজলিসে অবস্থান করে?

"উপহাসের মজলিসে অবস্থান করার" অবস্থা চার ধরন থেকে খালি নয়ঃ

প্রথমঃ এই উপহাস করাকে বিরোধিতা করা। এই ব্যক্তি প্রতিদান প্রাপ্ত হবে। আর এটাই হক্ব এবং ওয়াজিব (আবশ্যক)।

দ্বিতীয়ঃ উঠে পড়া এবং না বসা।

তিনি তা'আলা বলেন,

﴿ وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّىٰ يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ ﴾

"আর আপনি যখন ঐ সকল ব্যক্তিদের দেখেন, যারা আমাদের আয়াতসমূহ সম্বন্ধে উপহাসমূলক আলোচনায় মগ্ন হয়, তখন আপনি তাদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নিবেন, যতক্ষণ না তারা অন্য কথাবার্তায় লিপ্ত হয়।"[57]

তিনি তা'আলা বলেন,

وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّىٰ يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ ۚ إِنَّكُمْ إِذًا مِّثْلُهُمْ ﴿١٤٠﴾

---

[56] সুরা নিসা-১৪০

[57] সুরা আনআম-৬৮

"তিনি কিতাবে তোমাদের প্রতি নাযিল করেছেন যে, যখন তোমরা শুনবে, আল্লাহর আয়াতকে অস্বীকার করা হচ্ছে এবং তা নিয়ে বিদ্রুপ করা হচ্ছে, তখন তোমরা তাদের সাথে বসো না, যতক্ষণ না তারা অন্য প্রসঙ্গে লিপ্ত হয়, নয়তো তোমরাও তাদের মত হবে। মুনাফিক এবং কাফির সবাইকে আল্লাহ জাহান্নামে একত্র করবেন।"[58]

হয়তো সে বিরোধিতা করবে অথবা বের হয়ে যাবে যখন সে বিরোধিতা করতে সক্ষম না হবে।

অথবা সে বসে থাকে এবং চুপ থাকে। আর হুকুম সম্পর্কে সে জানে। তাহলে আয়াতের বক্তব্য অনুযায়ী এই ব্যক্তি তাদের মতই কাফির।

তিনি তা'আলার বাণীঃ

﴿ إِنَّكُمْ إِذًا مِّثْلُهُمْ ﴾

"নয়তো তোমরাও তাদের মত হবে।"[59]

অথবা সে চুপ থাকে। আর সে উপহাস করার হুকুম সম্পর্কে জানে না। তাহলে তার অজ্ঞতার উজর গ্রহণযোগ্য হবে ঐ ব্যক্তির ন্যায় যে কুফরি যুগ থেকে নতুন এসেছে অথবা যে মরুভূমিতে বেড়ে উঠেছে .... অন্যথায় কোন উজর নেই। কেননা আল্লাহ এবং তার দ্বীনকে সম্মান করা এমন এক বিষয় যার উপর মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে এবং তাদের নিকট এটা একটি জানা বিষয়।

[58] সুরা নিসা-১৪০

[59] সুরা নিসা-১৪০

লেখক رَحِمَهُ ٱللَّهُ বলেন,

"ইসলাম ভঙ্গের সপ্তম কারণঃ

যাদু করা। এর মধ্যে আরো রয়েছে ঘুরিয়ে দেওয়া এবং নমনীয় করা।[60] সুতরাং যে ব্যক্তি যাদু করবে অথবা যাদুর প্রতি সন্তুষ্ট হবে সে কাফির হয়ে যাবে। দলিল হল আল্লাহ তা'আলার বাণীঃ

﴿ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّىٰ يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ ﴾

"তারা উভয়েই এই কথা না বলে কাউকে শিক্ষা দিত না যে, আমরা নিছক একটি পরীক্ষা, কাজেই তুমি কুফরী করো না।"[61]

ব্যাখ্যাঃ

যাদুর শাব্দিক পরিচয়ঃ যা লুকায়িত থাকে এবং যার উদ্দেশ্য সুক্ষ্ম হয়। এর থেকেই রাতের শেষাংশকে সাহার (ভোর) নামে আখ্যায়িত করা হয়। কারণ এতে সকল কর্মকাণ্ড লুকায়িত থাকে।

পারিভাষিক অর্থে যাদু হলঃ এমন সংকল্প, ঝাড়ফুঁক, গিঠ, প্রতিষেধক ও ধূম্রময় যা অন্তর এবং শরীরসমূহে প্রভাব ফেলে। অতঃপর তা অসুস্থ করে দেয়, হত্যা করে ফেলে এবং ব্যক্তি ও তার স্ত্রীর মাঝে বিচ্ছেদ করে দেয়।

আলেমগণ যাদুর সংজ্ঞা নিয়ে মতভেদ করেছেন। এই মতভেদ হয় যাদুর অভ্যন্তরে এর বিভিন্ন প্রকার ও ধরন আধিক হওয়ার কারণে। এজন্য শানক্বীতি 'আয-ওয়াউল বায়ান' এ বলেন, ''পারিভাষিক অর্থে যাদুর অভ্যন্তরে বিভিন্ন প্রকারের আধিক্যতার কারণে একটি জামী' (সমন্বিত) মানী' (অন্তরায়) সংজ্ঞার মাধ্যমে যাদুর সংজ্ঞা দেওয়া সম্ভব হয় না এবং এ দুইয়ের মাঝে অংশীদারিত্বের পরিমাপ সাব্যস্ত হয় না। কোনটির জন্য তা জামী' হলে অন্যটির জন্য তা মানী' হয়। এ থেকেই যাদুর সংজ্ঞার ব্যাপারে আলেমগণের বর্ণনা বিপরীতমুখী ভিন্ন ভিন্ন হয়েছে।''[62]

---

[60] **ঘুরিয়ে দেওয়া হলঃ** স্বামীকে তার স্ত্রীর থেকে, তার বাড়ি থেকে এবং তার সন্তানাদি থেকে ঘুরিয়ে দেওয়া। সে শক্ত হৃদয়ের অধিকারী হয়ে যায়। ফলে বিচ্ছিন্নতাকে পছন্দ করে এবং এক সাথে থাকা অপছন্দ করে।
নমনীয় করা হলঃ ঘুরিয়ে দেওয়ার বিপরীত। তাকে কোন নারীর প্রতি নমনীয় করে দেওয়া হয় - হোক সে তার স্ত্রী অথবা অন্য কেউ। ফলে সে ঐ নারীর জন্য অনুগত দাসে পরিণত হয়। এবং কোন নারীর থেকে ঘুরিয়ে অন্য আরেক নারীর প্রতি নমনীয় করা হয়। [মাকতাবাতুল বায়্যিনাতের সংযুক্তি]

[61] সুরা বাকারাহ-১০২

[62] আয-ওয়াউল বায়ান-৪/৪৪৪

অধিকাংশ আহলুল ইলমগণের নিকট যাদুর বাস্তবতা রয়েছে। আর এটা আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআহ'র মাজহাব (মত)। মুতাযিলাদের বিপরীত।

তারা আল্লাহ তা'আলার এ বাণীর মাধ্যমে দলিল দেয়ঃ

﴿ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَىٰ ﴾

"তাদের যাদুর প্রভাবে তার নিকট মনে হল যেন সেগুলো ছুটোছুটি করছে।"[63] সুতরাং তিনি বলেছেন, ''তার নিকট মনে হল।''

প্রকৃতপক্ষে যাদুর বাস্তবতা রয়েছে। এব্যাপারে সাহাবীগণের, তাবেয়ীগণের এবং উম্মাহ'র সালাফগণের থেকে অনেক বর্ণনা রয়েছে।

যাদু হল কল্পনা যার কোন বাস্তবতা নেই যেমন পূর্বের আয়াতে বর্ণিত হয়েছে।[64]

দুই দিক থেকে যাদু শিরকের অন্তর্ভুক্ত হয়ঃ

প্রথমঃ যার মধ্যে রয়েছে জ্বিন ও শয়তানদের সেবা চাওয়া এবং আল্লাহকে বাদ দিয়ে তাদের ইচ্ছানুযায়ী তাদের নৈকট্য লাভ করা। যেন তারা যাদুকরকে তার উদ্দেশ্যে পৌঁছে দিতে পারে। আর যাদু হল শয়তানদের শিক্ষা। যেমন তিনি তা'আলা বলেন,

﴿ وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ ﴾

"বরং শয়তানরাই কুফরি করেছিল। তারা মানুষকে যাদু শিক্ষা দিত।"[65]

দ্বিতীয়ঃ যার মধ্যে রয়েছে ইলমুল গায়েবের (অদৃশ্যের জ্ঞান) দাবি করা এবং আল্লাহর বৈশিষ্ট্যসমূহের ক্ষেত্রে তার সাথে ঝগড়াবিবাদ করা -

﴿ قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ ﴾

"আপনি বলুন, আল্লাহ ব্যতীত নভোমন্ডল ও ভূমন্ডলে কেউ অদৃশ্যের জ্ঞান জানে না।"[66] এ ক্ষেত্রে আল্লাহর অংশীদারিত্বের দাবি করা কুফর এবং ভ্রষ্টতা।

---

[63] সুরা ত্বহা-৬৬

[64] এটা হল মুতাযিলাদের মত

[65] সুরা বাকারাহ -১০২

[66] সুরা নামল-৬৫

যাদুকরের হুকুমঃ আলেমগণ যাদুকরের হুকুমের ব্যাপারে ইখতিলাফ (মতভেদ) করেছেন। সে কাফির হবে কি হবে না?

লেখক رَحِمَهُ اللهُ এর কথার বাহ্যিক দিক হল, সে কাফির হয়ে যাবে। আল্লাহ তা'আলার এ বাণীর কারণেঃ

﴿ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّىٰ يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ ﴾

"তারা উভয়েই এই কথা না বলে কাউকে শিক্ষা দিত না যে, আমরা নিছক একটি পরীক্ষা, কাজেই তুমি কুফরি করো না।"[67]

এটা ইমাম আহমাদ, মালিক ও আবু হানিফা رَحِمَهُمُ اللهُ দের মত। এবং জুমহুর (অধিকাংশ) আলেমগণ এর উপরেই রয়েছেন। আয়াতের দৃশ্যমানতা তাই প্রমাণ করে, যে দিকে জুমহুর আলেমগণ মত দিয়েছেন।

শাফেয়ী رَحِمَهُ اللهُ মত দিয়েছেন যে, যখন যাদু শিক্ষা করা হবে তখন বলা হবে, তুমি আমাদের জন্য তোমার যাদুর বিবরণ দাও। অতঃপর সে যদি এমন কিছুর বিবরণ দেয় যা কুফরকে আবশ্যক করে - যেমন তারকাসমূহের নৈকট্য হাসিলের ক্ষেত্রে বাবেল অধিবাসীদের যাদু করা এবং এগুলোর থেকে যা কামনা করা হবে সেগুলো তা করবে - তাহলে সে কাফির হবে। আর যদি সে কুফরের সীমায় না পৌঁছায় এবং তা বৈধ হওয়ার ব্যাপারে বিশ্বাস করে তাহলেও সে হারামকে হালাল মনে করার কারণে কাফির হবে। অন্যথায় হবে না।

যাদুকরকে হত্যা করার হুকুমঃ

আলেমগণ رَحِمَهُمُ اللهُ এই মাস'আলার ক্ষেত্রে দুই বক্তব্যে মতভেদ করেছেনঃ

প্রথম বক্তব্যঃ তাকে হত্যা করা হবে। এটা জুমহুর (অধিকাংশ) আলেমগণের বক্তব্য।

দ্বিতীয় বক্তব্যঃ তাকে হত্যা করা হবে না। তবে যখন সে এমন কাজ করবে যা কুফর পর্যন্ত পৌঁছে দেয়। এটা শাফেয়ী رَحِمَهُ اللهُ এর বক্তব্য।

প্রথম বক্তব্যকারীগণ কয়েকটি দলিলের মাধ্যমে প্রমাণ পেশ করেছেনঃ

তিরমিযী, হাকিম, ইবনে আদী ও দারে কুতনী জুনদুব থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, আল্লাহর রাসুল ﷺ বলেছেন, "যাদুকরের হদ হল তাকে তরবারি দ্বারা হত্যা করা।" সঠিক কথা হল এই আছারটি জুনদুব পর্যন্ত মাওকুফ।

তারা আরো প্রমাণ পেশ করেছেন - আহমাদ এবং অন্যরা সহিহ সনদে বাজালাহ থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, "ওমরের মৃত্যুর এক বছর পূর্বে আমাদের নিকট তার একটি পত্র আসে। তাতে লিখা ছিল -

[67] সুরা বাকারাহ-১০২

তোমরা প্রত্যেক যাদুকরকে হত্যা কর। আবু সুফিয়ান বলেছেন, এবং মহিলা যাদুকরকে। অতঃপর আমরা তিনজন মহিলা যাদুকরকে হত্যা করেছি।''

তারা আরো প্রমাণ পেশ করে - যা হাফসা رضي الله عنها থেকে বর্ণিত হয়েছে - তিনি তার দাসীকে হত্যা করার আদেশ দেন যে তাকে যাদু করেছিল।

সাধারণভাবে যাদুকরকে হত্যা করা হবে বক্তব্যটি সঠিক। আর ওমর, জুনদুব এবং হাফসা رضي الله عنهم দের ব্যাপারে সাহাবীগণের বিপরীত জানা যায় না। নাবী ﷺ থেকে বর্ণিত হয়েছে তিনি বলেন, “তোমরা আমার পরে এই দুই ব্যক্তিকে অনুসরণ কর; আবু বকর এবং ওমর।'' এবং তিনি ﷺ বলেন, “নিশ্চয়ই আল্লাহ ওমরের মুখে ও তার অন্তরে হক্ব নির্ধারণ করেছেন।'' হাদিস সহিহ।

যাদুকর যদি তাওবা করে তাহলে আলেমগণের বক্তব্য অনুযায়ী সঠিক মত হল তার তাওবা গ্রহণ করা হবে। আর যাদুকর সবচেয়ে গুরুতর যে কাজটি করে তা হল শিরক। আল্লাহ মুশরিকদের ব্যাপারে বলেন,

﴿ قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ وَإِنْ يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ ﴾

“যারা কুফরি করেছে আপনি তাদেরকে বলুন, যদি তারা বিরত হয় তাহলে অতীতে যা হয়েছে তাদেরকে তা ক্ষমা করা হবে। আর যদি তারা পুনরায় করে তাহলে পূর্ববর্তীদের (ব্যাপারে আল্লাহর) রীতি তো গত হয়েছে।”[68]

অতএব যাদু করা হল শিরক। যাদু করার মধ্যে রয়েছেঃ তা শিক্ষা করা অথবা তা শিক্ষা দেওয়া অথবা তা করা অথবা এর প্রতি সন্তুষ্ট হওয়া কুফর। কেননা সন্তুষ্ট ব্যক্তি কার্যসম্পাদনকারীর মতই।

যাদুগ্রস্থ ব্যক্তির থেকে যাদুর প্রভাবমুক্ত করাঃ শারীয়াহ'র ভাষায় এই মাস'আলাকে নুশরাহ বলা হয়।

আল্লামা ইবনুল কাইয়্যিম رحمه الله বলেন, “যাদুগ্রস্থ ব্যক্তির থেকে যাদুর প্রভাবমুক্ত করা দুই প্রকারঃ

প্রথমঃ যাদুর মাধ্যমে যাদুর প্রভাবমুক্ত করা। এটা শয়তানের কাজ। হাসানের বক্তব্য এরই প্রমাণ করে - “যাদুকরই একমাত্র যাদুর প্রভাবমুক্ত করে।'' ফলে নাশির (প্রভাবমুক্তকারী) এবং মুনতাশির (যার থেকে প্রভাবমুক্ত করা হয়) শয়তানের নৈকট্য লাভ করে সে যেমন চায়। অতঃপর সে যাদুগ্রস্থ ব্যক্তির থেকে তার কাজ নষ্ট করে দেয়।

দ্বিতীয়ঃ বৈধ ঝাড়ফুঁক, মুআওয়ীযাত, চিকিৎসা এবং দু'আসমূহের মাধ্যমে যাদুর প্রভাবমুক্ত করা জায়েয।''

বুখারি তার সহিহ গ্রন্থে মুআল্লাক্বভাবে বর্ণনা করেছেন, “কাতাদাহ থেকে বর্ণিত - আমি ইবনুল মুসাইয়্যিবকে বললাম, একজন ব্যক্তি যাদুগ্রস্থ হয়েছে অথবা তার স্ত্রীর থেকে তাকে কজা করা হয়েছে।

[68] সুরা আনফাল-৩৮

তার থেকে কি যাদুর প্রভাবমুক্ত করা যাবে অথবা নুশরাহ’র মাধ্যমে তার চিকিৎসা করা যাবে? তিনি বললেন, তাতে কোন সমস্যা নেই। তারা এর মাধ্যমে সংশোধন করতে চায়। সুতরাং যা উপকার করে তা নিষিদ্ধ নয়।”

সুতরাং এটা নুশরাহ’র একটি প্রকার ধরা হবে যাতে কোন বিপদ নেই। কেননা নাবী ﷺ থেকে সহিহ সূত্রে হাদিস বর্ণিত হয়েছে যে, যখন তাকে নুশরাহ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল তখন তিনি বলেছেন, “এটা শয়তানের কাজ।”

যাদুকর এবং গণকের নিকট যাওয়ার হুকুম কি?

এই মাস’আলা দুই অবস্থা থেকে খালি নয়ঃ

প্রথম অবস্থাঃ মানুষ যাদুকর, গণক, জ্যোতির্বিদ এবং জ্যোতিষীদের নিকট যায় অতঃপর তাদেরকে কোন বিষয়ে জিজ্ঞাসা করে কিন্তু সে ব্যাপারে তাদেরকে সত্যায়ন করে না তাহলে এটা গুরুতর অপরাধ এবং কবিরাহ গুনাহ। ধারাবাহিকভাবে চল্লিশ রাত্রি তার সালাত কবুল হবে না। মুসলিম তার সহিহ গ্রন্থে সাফিয়্যাহ’র হাদিস বর্ণনা করেছেন, তিনি নাবী ﷺ এর এক স্ত্রীর থেকে বর্ণনা করেন, নাবী ﷺ বলেন “যে ব্যক্তি গণকের কাছে যায় অতঃপর তাকে কোন বিষয়ে জিজ্ঞাসা করে চল্লিশ রাত্রি তার সালাত কবুল হবে না।”

দ্বিতীয় অবস্থাঃ সে তাদের নিকট গেল অতঃপর তাদেরকে জিজ্ঞাসা করল এবং তাদেরকে সত্যায়ন করল এই ব্যক্তি আমাদের নাবী মুহাম্মাদ ﷺ এর নিকট যা নাযিল করা হয়েছে সে ব্যাপারে অস্বীকারকারী কাফির।

হাকিম সহিহ সনদে আবু হুরায়রাহ رضي الله عنه থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসুল ﷺ বলেছেন, “যে ব্যক্তি জ্যোতিষী অথবা গণকের কাছে গেল অতঃপর সে যা বলে সেটাকে সত্যায়ন করল সে মুহাম্মাদের উপর যা নাযিল করা হয়েছে সেটাকে অস্বীকার করল।”

বাযযার সহিহ সনদে ইবনে মাসউদ থেকে মাওকুফ সূত্রে বর্ণনা করেন, “যে ব্যক্তি গণক অথবা যাদুকরের নিকট যায় অতঃপর সে যা বলে সেটা সত্যায়ন করে সে মুহাম্মাদের উপর যা নাযিল করা হয়েছে সেটাকে অস্বীকার করে।”

লেখক رحمه الله বলেন,

“ইসলাম ভঙ্গের অষ্টম কারণঃ

মুসলিমদের বিরুদ্ধে মুশরিকদের সাহায্য করা এবং তাদের সমর্থন করা। দলিল আল্লাহ তা’আলার বাণীঃ

﴿ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴾

“তোমাদের মধ্য থেকে যে ব্যক্তি তাদের সাথে বন্ধুত্ব করবে, সে তাদেরই অন্তর্ভুক্ত। নিশ্চয়ই আল্লাহ জালিম সম্প্রদায়কে হিদায়াত দান করেন না।”[69]

ব্যাখ্যাঃ

যে ব্যক্তি মুসলিমদের বিরুদ্ধে মুশরিকদের সাহায্য করবে এবং তাদের সমর্থন করবে সে আল্লাহর হুমকি ও ধমকির সম্মুখীন হবে। সে আল্লাহ, তার রাসুল ও মু’মিনদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করবে এবং সে আল্লাহর অসন্তুষ্টি ও তার শাস্তির উপযুক্ত হবে। তিনি তা’আলা বলেন,

تَرَىٰ كَثِيرًا مِنْهُمْ يَتَوَلَّوْنَ الَّذِينَ كَفَرُوا ۚ لَبِئْسَ مَا قَدَّمَتْ لَهُمْ أَنْفُسُهُمْ أَنْ سَخِطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَفِي الْعَذَابِ هُمْ خَالِدُونَ ﴿٨٠﴾ وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مَا اتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَاءَ وَلَٰكِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ فَاسِقُونَ ﴿٨١﴾

“আপনি তাদের অনেককে দেখতে পাবেন, যারা কাফিরদের সাথে বন্ধুত্ব করে। তারা যা নিজেদের জন্য পেশ করেছে, তা কত মন্দ যে, আল্লাহ তাদের উপর ক্রোধান্বিত হয়েছেন এবং তারা আযাবেই চিরস্থায়ী থাকবে। আর যদি তারা আল্লাহ ও নাবীর প্রতি এবং যা তার নিকট নাযিল করা হয়েছে এর প্রতি ঈমান আনয়ন করত, তাহলে তারা তাদেরকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করত না। কিন্তু তাদের মধ্যে অনেকে ফাসিক।”[70]

আল্লাহ এটাকে মুনাফিকদের বৈশিষ্ট্যের মধ্যে নির্ধারণ করেছেন, তিনি তা’আলা বলেন,

بَشِّرِ الْمُنَافِقِينَ بِأَنَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿١٣٨﴾ الَّذِينَ يَتَّخِذُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ ۚ أَيَبْتَغُونَ عِنْدَهُمُ الْعِزَّةَ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا ﴿١٣٩﴾

---

[69] সুরা মায়িদাহ-৫১

[70] সুরা মায়িদাহ ৮০-৮১

"আপনি মুনাফিক্বদেরকে সুসংবাদ দিন যে, তাদের জন্য যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি রয়েছে। যারা মু'মিনগণের পরিবর্তে কাফিরদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করে তারা কি ওদের কাছে সম্মান চায়? সমস্ত সম্মান তো আল্লাহরই।"[71]

যে ব্যক্তি মুশরিকদের সাথে সম্পর্ক করে আল্লাহ তার হুকুম তাদের হুকুমের মতই নির্ধারণ করেছেন। তিনি বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ أَوْلِيَاءَ ۘ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۚ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿٥١﴾

"হে ঈমান্দারগণ তোমরা ইহুদী এবং খ্রিষ্টানদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ কর না। তারা একে অপরের বন্ধু। তোমাদের মধ্য থেকে যে ব্যক্তি তাদের সাথে বন্ধুত্ব করবে, সে তাদেরই অন্তর্ভুক্ত। নিশ্চয়ই আল্লাহ জালিম সম্প্রদায়কে হিদায়াত দান করেন না।"[72]

সুতরাং মু'মিনদের বিরুদ্ধে সম্পদ, অন্তর, বুদ্ধি এবং সাহায্য করার ধরনসমূহের কোন একটি ধরন দিয়েও কাফিরদের সাথে বন্ধুত্ব করা জায়েয নেই। যদিও অন্তরে তাদের প্রতি ভালবাসা না থাকে। আল্লাহ এর থেকে কঠিনভাবে সতর্ক করেছেন। তিনি তা'আলা বলেন,

﴿ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ ۗ ﴾

"তোমাদের মধ্য থেকে যে ব্যক্তি তাদের সাথে বন্ধুত্ব করবে, সে তাদেরই অন্তর্ভুক্ত।"[73]

এটা এর বাহ্যিকতার উপর সম্পন্ন হয় যে, সে তাদের হুকুমের অন্তর্ভুক্ত হবে।

ইবনে আব্বাস رضي الله عنهما বলেন, "সে তাদের মতই মুশরিক। কেননা যে ব্যক্তি শিরকের প্রতি সন্তুষ্ট থাকে সে মুশরিক।"

ইবনুল কাইয়্যিম 'আহকামু আহলুয যিম্মাহ'তে বলেন, "আল্লাহ ফায়সালা দিয়েছেন যে, - আর তার ফায়সালার চেয়ে উত্তম কোন ফায়সালা নেই - নিশ্চয়ই যে ব্যক্তি ইহুদী ও খ্রিষ্টানদের সাথে ওয়ালা (সম্পর্ক) করবে সে তাদেরই অন্তর্ভুক্ত হবে -

---

[71] সুরা নিসা ১৩৮-১৩৯

[72] সুরা মায়িদাহ-৫১

[73] সুরা মায়িদাহ-৫১

﴿ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ ﴾

"তোমাদের মধ্য থেকে যে ব্যক্তি তাদের সাথে বন্ধুত্ব করবে, সে তাদেরই অন্তর্ভুক্ত।"[74]

সুতরাং যখন কুরআনের বক্তব্য দ্বারা তাদের বন্ধু বা সাহায্যকারীরা তাদের অন্তর্ভুক্ত হবে তখন তাদের জন্য তাদের হুকুমই হবে।"[75]

কুরতুবী তার তাফসীরে বলেন, "তিনি তা'আলা স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছেন যে, তার হুকুম তাদের হুকুমের মতই। তিনি মুরতাদের থেকে মুসলিমের জন্য মিরাস নিষিদ্ধ করেছেন। অধিকন্তু সম্পর্ক ছিন্ন করণের ব্যাপারে এই হুকুম ক্বিয়ামাত পর্যন্ত টিকে থাকবে।"[76]

ইবনে হাযম বলেন, "নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলার বাণী সত্য যে,

﴿ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ ﴾

"তোমাদের মধ্য থেকে যে ব্যক্তি তাদের সাথে বন্ধুত্ব করবে, সে তাদেরই অন্তর্ভুক্ত।"[77]

এর বাহ্যিকতার ভিত্তিতে সে সকল কাফিরদের অন্তর্ভুক্ত একজন কাফির। এটাই সত্য, যে ব্যাপারে মুসলিমদের মধ্য থেকে দুইজন ব্যক্তিও ইখতিলাফ করেনি।"[78]

কোন মুসলিম কাফিরদের সাথে সম্পর্ক করার কারণে এবং মাসলাহা বা স্বার্থের যুক্তিতে মু'মিনদের বিরুদ্ধে তাদের সাহায্য করার কারণে তার উজর গ্রহণযোগ্য হবে না। কেননা তাওহীদের মাসলাহা বা স্বার্থ হচ্ছে সবচেয়ে বড় মাসলাহা যা উম্মাহ'র জন্য প্রত্যাশা করা হয়। আর শিরকের অনিষ্ট হচ্ছে সবচেয়ে বড় অনিষ্ট যা উম্মাহ'র থেকে দূর করা হয়। সুতরাং দুনিয়ার কোন বস্তুর প্রত্যাশার কারণে মু'মিনদের বিরুদ্ধে কাফিরদের সাহায্য করা বৈধ নয়। যেমন- সম্পদ অথবা নেতৃত্ব অথবা অন্যান্য বিষয় নিরাপদ করা। মুসলিমদের বিরুদ্ধে কাফিরদের সাহায্য করা কুফর এবং এমন রিদ্দাহ যা দ্বীন থেকে বের করে দেয়। আর এব্যাপারে আহলুল ইলমগণের ইজমা রয়েছে।

---

[74] সুরা মায়িদাহ-৫১

[75] আহকামু আহলিয যিম্মাহ-১/৬৭

[76] তাফসিরে কুরতুবী-৬/২১৭

[77] সুরা মায়িদাহ-৫১

[78] আল-মাহাল্লী

কাফিরদের সাথে ওয়ালা (সম্পর্ক) করার হুকুমঃ

তাদের সাথে সম্পর্ক করা দুই ভাগে বিভক্তঃ

১. মুওয়ালাতে কুবরা বা বড় সম্পর্ক (ওয়ালা) করাঃ এর হুকুম হল কুফর এবং এই মুওয়ালাত দ্বীন থেকে বের করে দেয়।

মুওয়ালাতে কুবরা চার প্রকারঃ

(ক). তাদের দ্বীনের (ধর্মের) কারণে তাদের ভালবাসা। যখন আপনি কাফিরদেরকে তাদের দ্বীনের কারণে ভালবাসবেন তখন সেটা কুফর হবে। এর দলিল হল ইবরাহীমের কথাঃ

﴿ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ ﴾

"তোমরা যেগুলোর ইবাদত কর নিশ্চয় আমি তাদের থেকে মুক্ত।"[79]

হাদিসে রয়েছে - ''এবং আল্লাহকে বাদ দিয়ে যার ইবাদাত করা হয় তাকে সে অস্বীকার করবে।'' আল্লাহ তা'আলার বাণীঃ

﴿ لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ﴾

"আল্লাহ এবং পরকালের প্রতি বিশ্বাস রাখে এমন কোন সম্প্রদায়কে আপনি পাবেন না তারা এমন ব্যক্তিদের সাথে বন্ধুত্ব করে যারা আল্লাহ ও তার রাসুলের বিরুদ্ধাচরণ করে।"[80]

(খ). মুসলিমদের বিরুদ্ধে তাদের সাহায্য করা। আমরা যখন কাফিরদেরকে অস্ত্র অথবা সম্পদ অথবা জীবন দ্বারা সাহায্য করব এবং তাদের সাথে মিলে মুসলিমদের বিরুদ্ধে লড়াই করব তখন এটা মুওয়ালাতে কুবরা হবে।

(গ). তাদের কুফরের ক্ষেত্রে তাদের অনুসরণ করা এবং তাদের সমর্থন করা। যেমন- আমরা তাদের মত পার্লামেন্ট এবং গণতন্ত্র তৈরি করব।

(ঘ). তাদের সাথে জোটবদ্ধ হওয়া। কেননা ওয়ালীর আরো একটি অর্থ হল জোটবদ্ধ হওয়া। যেমন- ইবনে আবি সালুল কিছু ইহুদীদের সাথে জোটবদ্ধ হয়েছিল।

২. মুওয়ালাতে ছুগরা বা ছোট সম্পর্ক (ওয়ালা) করাঃ এর হুকুম হল এটা দ্বীন থেকে বের করে দেয় না। কিন্তু এটা ছোট কুফর অথবা কবিরাহ গুনাহের অন্তর্ভুক্ত।

---

[79] সুরা যুখরুফ-২৬

[80] সুরা মুজাদালাহ-২২

এই প্রকারের শর্ত হল তাদের ব্যাপারে অন্তরে বিদ্বেষ রাখা এবং তাদের প্রতি ভালবাসা না থাকা।

এর ধরনগুলো হলঃ

- যেমন কোন প্রকার ভালবাসা, আন্তরিকতা, জোটবদ্ধ হওয়া, সাহায্য করা এবং সম্পর্ক (ওয়ালা) করা ব্যতীত তাদেরকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করা। শুধুমাত্র দুনিয়ার উদ্দেশ্যে ব্যক্তিগতভাবে বন্ধুত্ব করা এবং এ ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় বন্ধুত্ব অন্তর্ভুক্ত না হওয়া। যেমন- যদি কোন দাওলাতুল ইসলাম বা ইসলামী রাষ্ট্র কোন কাফির রাষ্ট্রের সাথে বন্ধুত্ব করে তাহলে সেটা রিদ্দাহ হবে। কেননা তা ওয়ালার এবং জোটবদ্ধ হওয়ার অর্থ হবে।

- তাদের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে তাদের সাদৃশ্য গ্রহণ করা তাদের কুফরির ক্ষেত্রে নয়।

- যেমন তাদের দুনিয়াবী উৎসবসমূহে উপস্থিত হওয়া। দ্বীনী (ধর্মীয়) উৎসবে নয়। কেননা এটি একটি অন্য বিষয়। এরকম আরো অনেক রয়েছে।

যুদ্ধকারী নয় সন্ধিকারী কাফিরদের সাথে পারস্পারিক লেনদেন করা কি ওয়ালার অন্তর্ভুক্ত হবে?

তাদের সাথে লেনদেন করা কয়েক ভাগে বিভক্তঃ

প্রথমতঃ পারস্পারিক লেনদেন শারীয়াহ সম্মত বিষয়ে হওয়া। যেমন বাণিজ্য এবং এরকম অন্যান্য বিষয়। সুতরাং এটা শারীয়াহ সম্মত একটি বিষয়। রাসুল ﷺ মৃত্যুবরণ করেছেন অথচ তার বর্ম এক ইহুদীর নিকট বন্ধক ছিল। এবং সাহাবীগণ কাফিরদের সাথে কেনা-বেচা করতেন। ইবনে মাজাহ’তে বর্ণিত হয়েছে এবং এছাড়া আরো তিনটি সনদ রয়েছে যা একটি অন্যটিকে শক্তিশালী করে। আলী رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ এক ইহুদী মহিলার নিকট কাজ করেছেন। সুতরাং তাদের সাথে ব্যবসা-বাণিজ্য অথবা কোন শারীয়াহসম্মত কাজে পারস্পারিক লেনদেন করা কিছু শর্তের আলোকে কোন সমস্যা নেইঃ

- এই লেনদেনের মধ্যে মুসলিমদের জন্য কোন অসম্মান এবং লাঞ্ছনা থাকবে না।

- এই লেনদেন কোন হারাম বিষয়ে হবে না।

- এই লেনদেন কাফিরদের সাথে ওয়ালা (সম্পর্ক) করার দিকে নিয়ে যাবে না।

একটি মাস’আলাঃ কাফিরদের দেশে সফর (ভ্রমণ) করার হুকুম কি?

চারটি শর্ত ব্যতীত কাফিরদের দেশে যাওয়া জায়েয নেইঃ

প্রথমঃ তার নিকট এমন ইলম (জ্ঞান) থাকা আবশ্যক যার মাধ্যমে সে ঐ কাফিরদের শুবুহাত (সন্দেহ) খণ্ডন করতে পারবে। যেন সে তার দ্বীনের ব্যাপারে ফিতনায় না পড়ে।

দ্বিতীয়ঃ তার নিকট এমন ঈমান বা বিশ্বাস থাকা যা তাকে ঐ কাফিরদের নিকট বিদ্যমান প্রবৃত্তি থেকে

বিরত রাখবে।

তৃতীয়ঃ সে তার দ্বীন প্রকাশ করতে পারা এবং কাফিরদের দ্বীন থেকে সম্পর্কচ্ছেদ করতে পারা। এই শর্তটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

চতুর্থঃ তার সফর (ভ্রমণ) কোন প্রয়োজনের জন্য হওয়া।

লেখক رَحِمَهُ اللهُ বলেন,

“ইসলাম ভঙ্গের নবম কারণঃ

যে ব্যক্তি এই বিশ্বাস করবে যে, কারো জন্য মুহাম্মাদ ﷺ এর শারীয়াহ থেকে বের হয়ে যাওয়ার অবকাশ রয়েছে যেমন মুসার শারীয়াহ থেকে খিযিরের বের হয়ে যাওয়ার অবকাশ ছিল - সে ব্যক্তি কাফির। দলিল আল্লাহ তা’আলার বাণীঃ

﴿ وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴾

“আর যে ব্যক্তি ইসলাম ব্যতীত অন্য কোন দ্বীন তালাশ করে, তার কাছ থেকে তা কখনো গ্রহণ করা হবে না। এবং সে আখিরাতে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে।”[81]

ব্যাখ্যাঃ

যে ব্যক্তি এই বিশ্বাস করবে যে, কারো জন্য মুহাম্মাদ ﷺ এর শারীয়াহ থেকে বের হয়ে যাওয়ার অবকাশ রয়েছে যেমন মুসার শারীয়াহ থেকে খিযিরের বের হয়ে যাওয়ার অবকাশ ছিল- সেই ব্যক্তি কাফির। এটা এজন্য যে, মুহাম্মাদ ﷺ এর শারীয়াহ ব্যাপকভাবে সকল দুই সৃষ্টিদ্বয়; জ্বিন ও মানুষ এবং আরব ও অনারবের জন্য। কেননা আমাদের নাবী মুহাম্মাদ ﷺ এর শারীয়াহ হল সর্বশেষ শারীয়াহ এবং বাকি সকল শারীয়াহ’কে রহিতকারী(বাতিলকারী)।

এই ভঙ্গের কারণটি কুরআন ও সুন্নাহ’র বক্তব্যসমূহকে অস্বীকার করা অন্তর্ভুক্ত করে, যে বক্তব্যগুলো রিসালাতের ব্যাপকতা বর্ণনা করে যা দিয়ে নাবী ﷺ কে প্রেরণ করা হয়েছে। তিনি তা’আলা বলেন,

﴿ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا ﴾

“আর আমরা তো আপনাকে সমগ্র মানুষের জন্যই সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে প্রেরণ করেছি।”[82]

তিনি তা’আলা বলেন,

﴿ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا ﴾

---

[81] সুরা আলে ইমরান-৮৫

[82] সুরা সাবা’-২৮

"আপনি বলুন, হে মানুষ! নিশ্চয় আমি তোমাদের সবার প্রতি আল্লাহর রাসুল।"[83]

তিনি তা'আলা বলেন,

﴿ تَبَارَكَ ٱلَّذِي نَزَّلَ ٱلْفُرْقَانَ عَلَىٰ عَبْدِهِۦ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا ﴾

"তিনি বরকতময় যিনি তার বান্দার উপর ফুরকান নাযিল করেছেন যেন সে জগতবাসীর জন্য সতর্ককারী হতে পারে।"[84]

সুসংবাদদাতা এবং সতর্ককারীরূপে - অর্থাৎ আপনি ঐ ব্যক্তিকে জান্নাতের সুসংবাদ দিবেন যে আপনার আনুগত্য করবে ও আপনার আদেশ পালন করবে এবং ঐ ব্যক্তিকে জাহান্নামের ব্যাপারে সতর্ক করবেন যে আপনার অবাধ্য হবে।

তিনি তা'আলা বলেন,

﴿ إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الإِسْلَامُ ﴾

"নিশ্চয়ই আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্য একমাত্র দ্বীন হল ইসলাম।"[85]

সহিহ হাদিসে বর্ণিত হয়েছে -আবু হুরায়রাহ رضي الله عنه থেকে বর্ণিত আল্লাহর রাসুল ﷺ বলেন, "ছয়টি বিষয়ের মাধ্যমে আমাকে নাবীগণের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দেওয়া হয়েছে। আমাকে জাওয়ামিউল কালাম (ব্যাপক অর্থবোধক কথা) দেওয়া হয়েছে,আমাকে ভীতি দ্বারা সাহায্য করা হয়েছে, আমার জন্য গনিমাহ হালাল করা হয়েছে, আমার জন্য পৃথিবীকে পবিত্র ও মসজিদে পরিণত করা হয়েছে, আমাকে সকল সৃষ্টির নিকট প্রেরণ করা হয়েছে এবং আমার মাধ্যমে নাবীগণকে সীল মারা হয়েছে।''

জাবির رضي الله عنه এর হাদিসে রয়েছে - "একজন নাবীকে নির্দিষ্টকরে তার সম্প্রদায়ের নিকট প্রেরণ করা হত। আর আমাকে সকল মানুষের নিকট প্রেরণ করা হয়ছে।''

জাবির رضي الله عنه থেকে আরো একটি সহিহ হাদিস বর্ণিত হয়েছে - রাসুল ﷺ বলেছেন, "আমাকে কালো এবং লালের নিকট প্রেরণ করা হয়েছে।'' সহিহ হাদিস সমূহ দ্বারা এটা প্রমাণিত যে, "মাসীহ ঈসা ইবনে মারইয়াম যখন আকাশ থেকে অবতরণ করবেন তখন তিনি মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল্লাহ ﷺ এর শারীয়াহ'র অনুসারী হবেন।''

---

[83] সুরা আ'রাফ-১৫৮

[84] সুরা ফুরক্বান-০১

[85] সুরা আলে ইমরান-১৯

এই হাদিস সুনির্দিষ্ট করে যে,মুহাম্মাদ ﷺ এর শারীয়াহ থেকে কারো বের হওয়ার অবকাশ নেই। আর এব্যাপারে অনেক দলিল রয়েছে।

মুহাম্মাদ ﷺ এর শারীয়াহ থেকে বের হয়ে যাওয়া দুই প্রকারঃ

১. বিশ্বাসগত বের হওয়া

২. আমলগত বের হওয়া

বিশ্বাসগত বের হওয়ার হুকুম হল কুফর এবং রিদ্দাহ। কেননা তা শারয়ী বক্তব্যসমূহকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে যা কুরআন ও সুন্নাহ'তে বর্ণিত হয়েছে।

এর বাস্তবতা হল- মানুষ বিশ্বাস করবে যে, রাসুল ﷺ এর শারীয়াহ তার জন্য আবশ্যক নয়। এর উদাহরণ হল - সীমালজ্ঞনকারী সুফীদের কেউ কেউ মনে করে তার বের হয়ে যাওয়ার অবকাশ রয়েছে। যখন সে ইয়াক্বীন বা আত্মবিশ্বাসের স্তরে পৌঁছাবে তখন শারয়ী আদেশসমূহ পালন করা আবশ্যক নয়। তারা আল্লাহ তা'আলার এ বাণীকে ব্যাখ্যা করে -

﴿ وَٱعۡبُدۡ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأۡتِيَكَ ٱلۡيَقِينُ ﴾

“আর আপনার ইয়াক্বিন (মৃত্যু) আসা পর্যন্ত আপনি আপনার রবের ইবাদাত করুন।”[86] ইয়াক্বীন হল পূর্ণ ঈমান যার পরে শারীয়াহ'র আদেশসমূহের কোন বিষয় দাবি করে না। এই ব্যাখ্যাটি বাতিল। কেননা ইয়াক্বীন দ্বারা উদ্দেশ্য হল মৃত্যু।

আমলগত বের হওয়া দুই প্রকারঃ

১. বড় বের হওয়া

২. ছোট বের হওয়া

বড় বের হওয়া হল যা সম্পূর্ণভাবে আমলের জিনস (জাতি) কে বর্জন করার মাধ্যমে হয়। ফলে সে আনুগত্যসমূহের কোন বিষয় আমল করে না। এর হুকুম হল কুফর এবং রিদ্দাহ। এব্যাপারে ইমাম আহমাদ হুমাইদী থেকে ইজমা নকল করেছেন। আমল অপরিহার্য। আমল ঈমান বিশুদ্ধ হওয়ার একটি শর্ত। আমল ব্যতীত ঈমান বিশুদ্ধ হওয়া সম্ভব নয়।

ছোট বের হওয়া হল যা এমন অন্যায়-অপরাধ করার মাধ্যমে হয় যেগুলো কুফর নয়। যেমন- যাকাত ছেড়ে দেওয়া অথবা সিয়াম ছেড়ে দেওয়া অথবা এমন কতিপয় ওয়াজিব ছেড়ে দেওয়া যেগুলো কুফর

[86] সুরা হিজর-৯৯

পর্যন্ত নিয়ে যায় না। বরং এগুলো হল পাপ। আমল ছেড়ে দেওয়ার উপর ভিত্তি করে তা সগিরাহ অথবা কবিরাহ গুনাহ হবে।

বের হওয়ার মাস'আলার সাথে তাক্বলীদের বড় একটি সম্পর্ক রয়েছে। কারণ মুক্বাল্লীদ (অনুসারী) মানুষের মধ্য থেকে একজন ব্যক্তির এমনভাবে তাক্বলীদ ও তাকে অনুসরণ করে কেমন যেন সে রাসুল ﷺ এর আদেশসমূহ এবং তার শারীয়াহ থেকে বের হয়ে গেছে।

তাক্বলীদ হল বক্তার কথাকে কোন প্রমাণ ছাড়াই গ্রহণ করা।

তাক্বলীদের অনেক ধরন রয়েছে যার কিছু সংখ্যক সঠিক এবং কিছু সংখ্যক বাতিলঃ

প্রথম ধরনঃ একজন সাধারণ মানুষ যার কোন জ্ঞান নেই, সাধারণ হওয়ার কারণে জ্ঞানার্জন করা সম্ভব নয় এবং সে জ্ঞানার্জনের উপকরণের মালিক হতে পারবে না। এই ব্যক্তির জন্য বৈধ যে, সে ঐ সকল বিষয়ের তাক্বলীদ করবে যে সকল বিষয়ে তাক্বলীদ করা সম্ভব হয়। যেমন শাখাগত ফিক্বহী বিধানসমূহ। কেননা এব্যাপারে প্রশস্ততা রয়েছে এবং এব্যাপারে সে সক্ষম হবে। আল্লাহ عَزَّ وَجَلَّ বলেন,

﴿ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾

"সুতরাং তোমরা জ্ঞানীদের নিকট জিজ্ঞাসা কর যদি তোমরা না জান।"[87]

আর যে সকল বিষয়ে তাক্বলীদ করা সম্ভব হয় না তা হল - যেমন আল্লাহর প্রতি ঈমান আনয়ন করা এবং আল্লাহর রাসুলের প্রতি ঈমান আনয়ন করা - এ ক্ষেত্রে কোন তাক্বলীদ নেই। তাতে শুধুমাত্র বিশ্বাস (ঈমান) ও সত্যায়ন রয়েছে।

দ্বিতীয় ধরনঃ এমন মানুষ পাওয়া যায়, যে একজন মানুষকে অনুসরণ (তাক্বলীদ) করে, সে তার অনুসরণ করাকে আবশ্যক করে নেয় এবং সে তার কথা থেকে বের হয় না। সে মনে করে সে একজন জাহিল (অজ্ঞ) এবং কুরআন ও সুন্নাহ'তে যা বর্ণিত হয়েছে সে অনুযায়ী আমল করা তার জন্য সম্ভব নয়। কোন সন্দেহ নেই যে, এটা আনুগত্যের ক্ষেত্রে শিরক। তিনি তা'আলা বলেন,

﴿ اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ ﴾

"তারা আল্লাহ ব্যতীত তাদের পণ্ডিত ও সংসার-বিরাগীদেরকে তাদের রব হিসেবে গ্রহণ করেছে এবং মারইয়ামের পুত্র মসীহকেও।"[88]

এটা একারণে যে, তারা তাদেরকে হালালকে হারাম করা অথবা হারামকে হালাল করার ক্ষেত্রে আনুগত্য

[87] সুরা আম্বিয়া-০৭

[88] সুরা তাওবা-৩১

করেছিল। সন্দেহাতীতভাবেই এই ধরনটি নিষিদ্ধ এবং এটাকে আল্লাহর সাথে শিরক হিসেবে গণ্য করা হয়।

তৃতীয় ধরনঃ যে ব্যক্তির নিকট ইলম (জ্ঞান) রয়েছে এবং বিধিবিধান ইস্তিম্বাত করার জন্য যার সক্ষমতা ও ইলম রয়েছে। কিন্তু সে হক্ব ও সত্য চেনার ক্ষেত্রে তার চেষ্টা-প্রচেষ্টা ব্যয় করে না। সন্দেহাতীতভাবে এই ব্যক্তির জন্য তাক্বলীদ (অনুসরণ) করা বৈধ নয় এবং হারাম। বরং ঐ ব্যক্তি আল্লাহর বিধান জানার ক্ষেত্রে দায়িত্বপ্রাপ্ত যখন সে এর যোগ্য হয় এবং তার নিকট এমন ইলম থাকে যার মাধ্যমে সে উদ্দিষ্ট মাস'আলায় আল্লাহ عَزَّ وَجَلَّ এর বিধান জানতে পারে।

চতুর্থ ধরনঃ যে ব্যক্তির নিকট আংশিক পরিমাণ ইলম রয়েছে এবং তার নিকট থাকা ইলমের মাধ্যমে সে আমল করে। কিন্তু সেখানে এমন কতিপয় সুক্ষ্ম মাস'আলা থাকে যার সঠিকটি জানার ক্ষেত্রে সে সক্ষম হয় না - তাতে কিছু জটিলতা থাকে এবং অতিরিক্ত চেষ্টা ব্যয় করা ও মেধা ব্যবহার করার প্রয়োজন হয়। এ ক্ষেত্রে তাক্বলীদ (অনুসরণ) করাতে কোন সমস্যা নেই।

পঞ্চম ধরনঃ যে ব্যক্তির অনুসন্ধান এবং ইস্তিম্বাত করার সক্ষমতা রয়েছে। কিন্তু তার উপর দুর্ঘটনা নেমে আসে। ফলে তার কাছে এমন সময় নেই যাতে সে ঐ দুর্ঘটনার বিধান অনুসন্ধান করবে। তাহলে তার জন্য কি এই অধিকার রয়েছে যে, সে আলেমগণের মধ্য থেকে কোন আলেমের কথা দ্বারা ফাতাওয়া দিবে, নাকি সে মাস'আলার ক্ষেত্রে থেমে যাবে। এই ধরনটির ব্যাপারে আহলুল ইলমগণের মাঝে ইখতিলাফ রয়েছেঃ

- তাদের মধ্য থেকে কেউ কেউ বলেন, সে মাস'আলার ক্ষেত্রে থেমে যাবে। তাদের মধ্যে অন্য কেউ কেউ বলেন, সে আলেমগণের মধ্য থেকে কোন আলেমের কথা দ্বারা ফাতাওয়া দিবে। সঠিক হল -বিস্তারিত আল্লাহই ভালো জানেন - যদি এই দুর্ঘটনা দীর্ঘায়িত করা সম্ভব না হয় বরং নিষ্পত্তি করা ও তাতে সিদ্ধান্ত দেওয়া জরুরী হয় তাহলে এ অবস্থাতে সে ব্যক্তি কোন আলেমের মতামত দ্বারা ফাতাওয়া দিবে। আর যদি ঐ দুর্ঘটনা দীর্ঘায়িত করা সম্ভব হয় তাহলে কোন আলেমের মতামত দ্বারা ফাতাওয়া দেওয়া তার জন্য জায়েয নয়। বরং তার জন্য অপরিহার্য হচ্ছে সে অনুসন্ধান করতে থাকবে যতক্ষণ না সে বিধানে পৌঁছতে পারে।

শাইখ رَحِمَهُ اللَّهُ বলেন, "যেমন মুসা عَلَيْهِ السَّلَام এর শারীয়াহ থেকে খিযিরের বের হয়ে যাওয়ার অবকাশ ছিল।" এখানে খিযির عَلَيْهِ السَّلَام এর সাথে সম্পৃক্ত কিছু বিষয় রয়েছে। তিনি কি নাবী? প্রকৃতপক্ষে কি তিনি মুসার শারীয়াহ থেকে বের হয়ে গিয়েছেলেন?

প্রথমত আহলুল ইলমগণ খিযির عَلَيْهِ السَّلَام এর ব্যাপারে তিন বক্তব্যে ইখতিলাফ করেছেনঃ

১. তাদের মধ্য থেকে একদল বলেছেন, তিনি একজন নাবী।

২. তাদের মধ্য থেকে আরেক দল বলেছেন, তিনি একজন সৎ লোক নাবী নন।

৩. তাদের মধ্য থেকে আরো একদল বলেছেন, তিনি ফিরিস্তাদের মধ্য থেকে একজন ফিরিস্তা।

প্রথম উক্তিটিই সঠিক তিনি একজন নাবী।

নিম্নবর্তী বিষয়গুলো এর দলিলঃ

আল্লাহ عَزَّوَجَلَّ তার ব্যাপারে সংবাদ দিয়েছেন যে, তিনি তাকে তার পক্ষ থেকে রহমত দান করেছেন এবং তার পক্ষ থেকে তিনি তাকে ইলম শিক্ষা দিয়েছেন। এটাই তার নবুওয়াতের ব্যাপারে দলিল। তিনি তা'আলা বলেন,

﴿ فَوَجَدَا عَبْدًا مِنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْمًا ﴾

"অতঃপর তারা আমাদের বান্দাদের মধ্য থেকে এক বান্দাকে পেল, যাকে আমরা আমাদের পক্ষ থেকে রহমত দান করেছি এবং তাকে আমাদের পক্ষ থেকে জ্ঞান শিক্ষা দিয়েছি।"[89]

মুসা عَلَيْهِ السَّلَامُ এর সাথে যা হওয়ার ছিল তা হওয়ার পর তিনি অবহিত করেছেন যে, তিনি যা করেছেন তা তার ক্ষমতাবলে করেননি। তা কেবলমাত্র আল্লাহ عَزَّوَجَلَّ এর পক্ষ থেকে আদেশ। যেমন তিনি তা'আলা তার ভাষাতে বলেছেন,

﴿ وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي ﴾

"আর আমি তা নিজ থেকে করিনি।"[90]

সুতরাং তিনি যা করেছেন তা তার পক্ষ থেকে ইজতিহাদের মাধ্যমে নয়। তা হয়েছে আল্লাহ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ এর আদেশের মাধ্যমে।

খিযির যেমন তার ঘটনাতে মুসা عَلَيْهِ السَّلَامُ এর সাথে এক নির্দোষ ব্যক্তিকে হত্যা করেছেন। এই নির্দোষ ব্যক্তিকে হত্যা করা মানুষের পক্ষ থেকে কারো জন্য সম্ভব নয় - একমাত্র আল্লাহর পক্ষ থেকে ওহী ব্যতীত। মানুষের মধ্য থেকে কারো জন্য, কোন সৎ লোকের জন্য এবং অন্য কারো জন্য একজন নির্দোষ ব্যক্তিকে হত্যা করা বৈধ নয় - শুধুমাত্র আল্লাহ عَزَّوَجَلَّ এর পক্ষ থেকে অনুমতি ব্যতীত ও তার পক্ষ থেকে ওহী ব্যতীত।

সুতরাং এরপরে আমাদের জন্য স্পষ্ট হল যে, খিযির عَلَيْهِ السَّلَامُ আল্লাহ عَزَّوَجَلَّ এর নাবীগণের মধ্য থেকে একজন নাবী ছিলেন। তিনি মুসা عَلَيْهِ السَّلَامُ এর শারীয়াহ থেকে বের হয়ে যাননি। আর মুসা عَلَيْهِ السَّلَامُ কে সকল

89 সুরা কাহাফ-৬৫

90 সুরা কাহাফ-৮২

মানুষের জন্য প্রেরণ করা হয়নি। তাকে প্রেরণ করা হয়েছিল শুধুমাত্র ইহুদী এবং ফিরআউনের নিকট। খিযির মুসার সম্প্রদায়ের মধ্য থেকেও নয়। সুতরাং এর উপর ভিত্তি করে কোন ব্যক্তির জন্য মুহাম্মাদ ﷺ এর শারীয়াহ থেকে বের হয়ে যাওয়ার বৈধতার উপর খিযিরের ঘটনা দ্বারা দলিল পেশ করা সঠিক হবে না।

লেখক رَحِمَهُ ٱللَّٰهُ বলেন,

"ইসলাম ভঙ্গের দশম কারণঃ

আল্লাহ্ তা'আলার দ্বীন থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়া এই অবস্থায় যে, সে তা শিক্ষা করে না এবং এর উপর আমল করে না।

দলিল হল আল্লাহ তা'আলার বাণীঃ

﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا ۚ إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ ﴾

"তার চেয়ে বড় যালিম আর কে হতে পারে? যে ব্যক্তি তার রবের আয়াতসমূহ দ্বারা উপদেশপ্রাপ্ত হয়ে তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, নিশ্চয় আমরা অপরাধীদের থেকে প্রতিশোধ গ্রহণকারী।"[91]

ব্যাখ্যাঃ

আল্লাহর দ্বীন থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়া যার মাধ্যমে মুখ ফিরানো ব্যক্তি কাফির হয়ে যায়। তা হল এই দ্বীনের মূলনীতি (আসলুদ-দ্বীন) শিক্ষা করা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়া। সুতরাং আল্লাহর দ্বীন থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়া, তা বর্জন করা এবং তা গ্রহণ না করা এইভাবে যে, আল্লাহর দ্বীন থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়া, তা শিক্ষা না করা এবং এবং এর উপর আমল না করা। ফলে এই মুখ ফিরানো ও বর্জনের মাধ্যমে সে কাফির হয়ে যাবে।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

﴿ وَالَّذِينَ كَفَرُوا عَمَّا أُنْذِرُوا مُعْرِضُونَ ﴾

"আর যারা কুফরী করে, তাদেরকে যে বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে তা থেকে তারা বিমুখ।"[92]

যেমনিভাবে বিশ্বাস, কথা, কাজ ও অস্বীকার করার মাধ্যমে কুফরি হয় তেমনিভাবে মুখ ফিরানো ও বর্জন করার মাধ্যমেও কুফরি হয়।

মুখ ফিরিয়ে নেওয়া দুই প্রকারঃ

১. বিশ্বাসগত মুখ ফিরিয়ে নেওয়া। ২. আমলগত মুখ ফিরিয়ে নেওয়া।

---

[91] সুরা সাজদাহ-২২

[92] সুরা আহক্বাফ-০৩

বিশ্বাসগত মুখ ফিরিয়ে নেওয়ার হুকুম হল কুফর ও রিদ্দাহঃ তা হল এই দ্বীনের মূলনীতি বা আসলুদ-দ্বীন শিক্ষা করা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়া। লেখক এখানে তাই উদ্দেশ্য করেছেন।

আমলগত মুখ ফিরিয়ে নেওয়ার হুকুম কুফর নয় এবং তা মিল্লাহ থেকে বের করে দেয় না। বরং তা এমন পাপ যার জন্য বান্দা শাস্তির উপযুক্ত হয় - যখন তা সম্পূর্ণরূপে মুখ ফিরিয়ে নেওয়া না হয়। আর বাস্তবতা হল ব্যক্তির সাথে ঈমানের ভিত্তি থাকা। কিন্তু সে কতিপয় ওয়াজিব (আবশ্যকীয়) কাজ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে।

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়্যাহ 'মাজমুউল ফাতাওয়া'তে বলেন, ''একজন ব্যক্তি আল্লাহ এবং তার রাসুলের প্রতি পরিপূর্ণ বিশ্বাসী হবে না এমন ওয়াজিবাতের (আবশ্যকীয় বিষয়ের) কোন অংশের অনুপস্থিতির সাথে যেগুলো আবশ্যক করার সাথে মুহাম্মাদ ﷺ সংশ্লিষ্ট হয়েছেন।''[93]

আল্লাহর দ্বীন থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়া ব্যক্তি - যে তা শিক্ষা করে না এবং এর প্রতি আমল করে না তার ঐ জাহালতের (অজ্ঞতার) উজর গ্রহণযোগ্য হবে না যা সে দূর করতে সক্ষম। অন্যথায় ইলম (জ্ঞান) থেকে জাহালত (অজ্ঞতা) কল্যাণকর হত।

ইবনুল কাইয়্যিম 'মিফতাহু দারিস-সা'আদাহ'তে বলেন, ''প্রত্যেক এমন ব্যক্তি যে ওহীর মাধ্যমে হিদায়াত লাভ করা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় - যা আল্লাহর কুরআন - ক্বিয়ামাতের দিন তার এ কথা বলা আবশ্যক যে,

﴿ يَا لَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ فَبِئْسَ الْقَرِينُ ﴾

"হায়! আমার ও তোমার মধ্যে যদি পূর্ব ও পশ্চিমের ব্যবধান থাকত! সুতরাং এ সহচর কতই না নিকৃষ্ট!"[94]

[93] মাজমুউল ফাতাওয়া-৭/৬২১

[94] সুরা যুখরুফ-৩৮

অতঃপর লেখক رَحِمَهُ اللهُ এই ভঙ্গের কারণগুলো তার এ কথার মাধ্যমে সমাপ্ত করেছেন,

"এই ভঙ্গের কারণগুলোর ক্ষেত্রে রসিকতাকারী, আন্তরিক ব্যক্তি এবং ভয়কারীর মাঝে কোন পার্থক্য নেই। শুধুমাত্র যাকে বাধ্য করা হয় সে ব্যতীত।"

ব্যাখ্যাঃ

ইসলাম ভঙ্গের ষষ্ঠ কারণের মধ্যে রসিকতাকারীর ব্যাপারে আলোচনা পূর্বে হয়েছে। তার কুফরির ব্যাপারে উজর গ্রহণযোগ্য হবে না। আল্লাহ উপহাসকারীদের কুফরির ব্যাপারে হুকুম দিয়েছেন যারা বলেছিল -

﴿ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ ﴾

"আমরা আলাপচারিতা ও খেল-তামাশা করছিলাম।"[95]

অতঃপর তিনি বলেন,

﴿ لا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ ﴾

"তোমরা ওজর পেশ করোনা। তোমরা তো ঈমান আনার পর কুফরি করেছো।"[96]

সুতরাং রসিকতাকারীর হুকুম যখন এটা হবে। তাহলে আন্তরিক ব্যক্তি তো অধিকতর যোগ্য। আর এব্যাপারে ইজমা রয়েছে।

ইবনে নাজিম 'বাহরুর রাইক্ব'এ বলেন, "যে ব্যক্তি রসিকতা করে অথবা খেলাচ্ছলে কুফরি কথা বলে সে সকলের নিকট কাফির হয়ে যাবে। তার আক্বীদাহ'র (বিশ্বাসের) বিষয়টি গণ্য করা হবে না।"[97]

কুফরির ক্ষেত্রে ভয়কারীর কোন উজর নেই যতক্ষণ না তাকে আশ্রয় নেওয়ার মত বাধ্য করা হয়। যেমন তার গর্দানে তরবারি রেখে তাকে কুফরি কথা বলতে বলা হল - যেমন রাসুল ﷺ কে গালি দেওয়া। অথবা তাকে কুফরি করতে বলা হল - যেমন মূর্তিকে সিজদা করা। শর্ত হচ্ছে তার অন্তর ঈমানের প্রতি প্রশান্ত থাকা আবশ্যক। তিনি তা'আলা বলেন,

مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالإِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ

---

[95] সুরা তাওবা-৬৫

[96] সুরা তাওবা-৬৬

[97] বাহরুর রাইক্ব-৫/১৩৪

وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ۝

“যে ব্যক্তি ঈমান আনয়ন করার পর আল্লাহর সাথে কুফরি করে তবে সে ব্যতীত যাকে বাধ্য করা হয়েছে এবং তার অন্তর ঈমানের প্রতি প্রশান্ত থাকে। তবে কুফরির জন্য হৃদয় উন্মুক্ত রাখলে তার উপর আল্লাহর গযব পতিত হবে এবং তার জন্য রয়েছে মহাশাস্তি।”[98]

ইসলাম ভঙ্গের কারণসমূহ শেষ।

[98] সুরা নাহল-১০৬

পরিশিষ্টঃ

আমরা এই পরিশিষ্টে মুরতাদের পরিচয় এবং তার সাথে সংশ্লিষ্ট বিধান সম্পর্কে আলোচনা করব। আল্লাহ সহায় হোন।

শাব্দিক এবং শারয়ী পরিভাষায় মুরতাদের পরিচয়ঃ

শাব্দিক অর্থে মুরতাদ হল প্রত্যাবর্তনকারী। বলা হয়, সে ফিরে গিয়েছে। সুতরাং যখন সে ফিরে যায় তখন সে মুরতাদ। তিনি তা'আলা বলেন,

﴿ وَلَا تَرْتَدُّوا عَلَىٰ أَدْبَارِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ ﴾

"এবং তোমরা তোমাদের পেছনে ফিরে যেয়ো না, তাহলে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে প্রত্যাবর্তন করবে।"[99]

শারয়ী পরিভাষায় মুরতাদ হলঃ যে ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করার পর কথা অথবা বিশ্বাস অথবা সন্দেহ অথবা ইচ্ছাকৃত কাজের মাধ্যমে কুফরি করে যদিও সে রসিকতাকারী হয়। তবে যাকে বাধ্য করা হয়েছে সে নয়।

মুরতাদের সাথে সংশ্লিষ্ট বিধানসমূহকে আমরা দুই ভাগে বিভক্ত করবঃ

১. আখিরাতে মুরতাদের বিধানসমূহ।

২. দুনিয়াতে মুরতাদের বিধানসমূহ।

আখিরাতের বিধানসমূহের মধ্যে রয়েছেঃ

- মুরতাদ যখন তার রিদ্দাহ'র উপর মারা যাবে তখন তার পাপ ক্ষমার অযোগ্য। তিনি তা'আলা বলেন,

﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ ﴾

"নিশ্চয়ই আল্লাহ তার সাথে শরীক করাকে ক্ষমা করেন না। এছাড়া অন্যান্য অপরাধ ক্ষমা করেন।"[100]

সে জাহান্নামে চিরস্থায়ী অবস্থান করবে। আর জান্নাত তার জন্য হারাম। তিনি তা'আলা বলেন,

[99] সুরা মায়িদাহ-২১

[100] সুরা নিসা-৪৮

وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۖ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢١٧﴾

"আর তোমাদের মধ্য থেকে যে কেউ নিজের দ্বীন থেকে ফিরে যাবে অতঃপর কাফির হয়ে মৃত্যুবরণ করবে, দুনিয়া ও আখিরাতে তাদের আমলসমূহ নিস্ফল হয়ে যাবে। আর এরাই জাহান্নামের অধিবাসী, সেখানে তারা চিরস্থায়ী থাকবে।"[101]

মুরতাদ যখন তার রিদ্দাহ'র উপর মৃত্যুবরণ করবে তখন তার সকল ইবাদাত ও আনুগত্যমূলক কাজ নষ্ট হয়ে যাবে এবং এর জন্য তাকে কোন প্রতিদান দেওয়া হবে না। যেমন পূর্বের আয়াতে বর্ণিত হয়েছে।

দুনিয়ার বিধানসমূহের মধ্যে রয়েছেঃ

- মুরতাদ যখন মৃত্যুবরণ করবে তখন তাকে গোসল দেওয়া হবে না এবং তার জানাযার সালাত পড়া হবে না।

- মুরতাদ যখন মৃত্যুবরণ করবে তখন তাকে মুসলিমদের কবরে দাফন দেওয়া হবে না।

কোন মুসলিমের জন্য তাকে গোসল দেওয়া এবং তাকে কাফন পড়ানো জায়েয নয়। কেননা রাসুল ﷺ কোন গোসল এবং কাফন পড়ানো ছাড়াই বদরের নিহত মুশরিকদেরকে কূপে নিক্ষেপ করেছিলেন। তার জানাযার সালাত পড়া জায়েয নয় - আল্লাহ عَزَّوَجَلَّ এর এ বাণীর কারণে -

﴿ وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا ﴾

"তাদের মধ্যে কারো মৃত্যু হলে আপনি কখনো তার জন্য জানাযার সালাত পড়বেন না।"[102]

তাদের জন্য ক্ষমা এবং রহমতের দু'আ করা যাবে না অথবা এ কথা বলা যাবে না - মরহুম অমুক - আল্লাহ جَلَّوَعَلَا এর এ বাণীর কারণে -

﴿ مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَىٰ ﴾

"নাবী ও মুমিনদের জন্য উচিত নয় যে, তারা মুশরিকদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করবে। যদিও তারা আত্মীয় হয়।"[103]

---

[101] সুরা বাকারাহ-২১৭

[102] সুরা তাওবা-৮৪

[103] সুরা তাওবা-১১৩

এমনিভাবে মুসলিমের জন্য অমুসলিমের দাফনের দায়িত্ব নেওয়া জায়েয নয় যেমন সে মৃত মুসলিমদের দাফন করে। আর যদি মৃত কাফিরের এমন কোন নিকটাত্মীয় না থাকে যে তার দাফন করবে তাহলে মুসলিমের জন্য আবশ্যক হল সে তার মৃতদেহ মাটি দিয়ে ঢেকে দিবে যেন তার দুর্গন্ধে সৃষ্টিজীব কষ্ট না পায়। এমনিভাবে মুসলিমের জন্য তার জানাযার অনুসরণ করা অথবা হাটা অথবা তাদের সাথে তার জানাযা বহন করা অথবা তার দাফনে উপস্থিত হওয়া জায়েয নয় যখন তার পরিবার তার দাফন করার ইচ্ছা করবে - আল্লাহ جَلَّ وَعَلَا এর এবাণীর কারণে -

﴿ وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ ﴾

“এবং তার কবরের পাশে দাঁড়াবেন না।”[104]

তাকে মুসলিমদের কবরস্থানে দাফন দেওয়া জায়েয নয়। বরং তাকে তার মত অমুসলিমদের কবরস্থানে দাফন দেওয়া হবে - নাবী ﷺ এর কাজের এবং এব্যাপারে মুসলিমগণের ইজমা থাকার কারণে।

- মুরতাদের যবেহকৃত বস্তু খাওয়া হালাল নয়।

- সে মক্কাতে প্রবেশ করবে না। কেননা মক্কাতে কাফিরদের প্রবেশ করা জায়েয নয়। আল্লাহ তা’আলা বলেন,

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَٰذَا ﴾

“হে মু’মিনগণ মুশরিকরা অপবিত্র, কাজেই এ বছরের পর তারা যেন মাসজিদুল হারামের ধারে-কাছে না আসে।”[105]

- মুরতাদ যখন দারুল ইসলামে থাকবে তখন তাকে তাওবা করতে বলা মুস্তাহাব। হয়তো সে তাওবা করবে অথবা তাকে মুরতাদ হিসেবে হত্যা করা হবে। আর যদি সে দারুল হারবে অবস্থান করে তাহলে তাওবা করতে বলা ছাড়াই তাকে হত্যা করা হবে। বুখারি আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ এর হাদিস বর্ণনা করেছেন তিনি বলেন, আল্লাহর রাসুল ﷺ বলেছেন, “যে ব্যক্তি তার দ্বীন পরিবর্তন করে তোমরা তাকে হত্যা কর।”

তার মাঝে এবং তার মুসলিম স্ত্রীর মাঝে বিচ্ছিন্ন করা আবশ্যক। কারণ স্ত্রী মুসলিম আর সে কাফির। মুসলিম নারী কাফিরের বন্ধনে অবস্থান করবে না। আল্লাহ তা’আলা বলেন,

---

[104] সুরা তাওবা-৮৪

[105] সুরা তাওবা-২৮

﴿ لا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ ﴾

“মু’মিন নারীগণ কাফিরদের জন্য বৈধ নয় এবং কাফিরগণ মু’মিন নারীদের জন্য বৈধ নয়।”[106] অর্থাৎ কাফিররা। তিনি তা’আলা বলেন,

﴿ وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ ﴾

“আর তোমরা মুশরিক নারীদের বিয়ে করো না, যতক্ষণ না তারা ঈমান আনে।”[107]

মুরতাদের জন্য তার মুসলিম নিকটাত্মীয়দের মধ্য থেকে কাউকে উত্তরাধিকার বানানো হারাম। এব্যাপারে আলেমগণের ঐক্যমত রয়েছে।

বিধানের দিক থেকে মুরতাদের সম্পদ দুই অবস্থা থেকে খালি নয়ঃ

১. মুরতাদ যদি দারুল ইসলামে অবস্থান করে তাহলে তার সম্পদ আটকে রাখা হবে। যদি সে তাওবা করে তাহলে তা তার নিকট ফিরিয়ে দেওয়া হবে। আর যদি সে মৃত্যুবরণ করে অথবা তাকে হত্যা করা হয় তাহলে তার সম্পদ মুসলিমদের বায়তুল মালে পৌঁছিয়ে দেওয়া হবে। কেননা তার নিকটাত্মীয়রা তার উত্তরাধিকারী হবে না। যেমন জুমহুর (অধিকাংশ) আলেমগণ এব্যাপারেই মত দিয়েছন। তারা দলিল পেশ করেছেন - যা নাসাঈ এবং অন্যরা বর্ণনা করেছেন, উসামা ইবনে যায়েদ رضي الله عنهما এর হাদিস - আল্লাহর রাসুল ﷺ বলেছেন, “কাফির মুসলিমের উত্তরাধিকারী হয় না এবং মুসলিম কাফিরের উত্তরাধিকারী হয় না।’’

২. মুরতাদ যদি দারুল হারবে মিলিত হয় তাহলে - ইবনে কুদামা ‘মুগনী’তে বলেন, ‘‘মুরতাদ যদি দারুল হারবে যুক্ত হয় তাহলে তার মালিকানা দূর হয়ে যায় না। কিন্তু তাওবা করতে বলা ছাড়াই প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য তাকে হত্যা করা বৈধ এবং যে তার উপর ক্ষমতাবান হবে তার জন্য তার সম্পদ গ্রহণ করা বৈধ। কেননা সে হারবী (যুদ্ধরত) হয়ে গেছে। তার হুকুম আহলুল হারবদের হুকুমের মত। এমনিভাবে যদি কোন দল মুরতাদ হয়ে যায় এবং তারা তাদের ভূমিতে মুসলিমদের ইমামের আনুগত্য করা থেকে বিরত থাকে তাহলে তাদের জীবন ও তাদের সম্পদের ক্ষেত্রে তাদের নিরাপত্তা দূর হয়ে যাবে। কেননা আসলী কাফিরদের জন্য তাদের ভূমিতে কোন নিরাপত্তা নেই। আর মুরতাদের ক্ষেত্রে তো আরো অধিকতর উপযুক্ত।....... তিনি আরো বলেন, মুরতাদ যদি দারুল হারবে এসে পড়ে তাহলে এ ক্ষেত্রে হুকুম হল ঐ মুরতাদের হুকুমের ন্যায় যে মুরতাদ দারুল ইসলামে অবস্থান করে। তবে তার সাথে থাকা সম্পদ ব্যতীত, তা ঐ ব্যক্তির জন্য বৈধ যে তার উপর ক্ষমতাবান হবে যেমন তার রক্ত বৈধ।’’....শেষ।

---

[106] সুরা মুমতাহিনা-১০

[107] সুরা বাক্বারাহ-২২১

দারুল কুফর থেকে হিজরত আবশ্যক হওয়ার ব্যাপারে আলোচনায় ইবনে হাযম رَحِمَهُ ٱللَّٰهُ বলেন, ‘‘যে ব্যক্তি দারুল কুফর ও দারুল হারবে ইচ্ছাকৃতভাবে যুক্ত হয় এবং তার পার্শ্ববর্তী মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে তাহলে সে এই কাজের মাধ্যমে মুরতাদ হয়ে যাবে। তার জন্য মুরতাদদের বিধানসমূহ জাড়ি হবে - যেমন ক্ষমতাবান হলে তাকে হত্যা করা আবশ্যক, তার সম্পদ বৈধ ঘোষণা করা এবং তার বিবাহ বাতিল হওয়া।…’’ শেষ।

এতোটুকুই আর আল্লাহই সবচেয়ে ভালো জানেন।

হে আল্লাহ আমাদের নাবী মুহাম্মাদ, তার পরিবার এবং তার সকল সঙ্গীগণের উপর রহমত বর্ষণ করুন!

আপনারা আমাদেরকে আপনাদের কল্যাণজনক দু’আয় ভুলবেন না।

লেখকের সংক্ষিপ্ত জীবনী[108]

শাইখুল মুজাহিদ আনাস ইবনে আলী ইবনে আব্দুল আজিজ আন-নাশওয়ান। আবু মালিক আত-তামিমী নামে পরিচিত। জাযিরাতুল আরবে জন্মগ্রহণ করেন এবং সেখানেই সম্মানিত ধনাঢ্য পরিবারে বেড়ে উঠেন। শাইখ আবু মালিক জাযিরাতুল আরবে একদল আলেমের নিকট থেকে শারয়ী ইলম অর্জন করেন। ইমামুদ-দাওয়াহ আল-ইলমী ইনিস্টিটিউট থেকে তিনি ডিগ্রী লাভ করেন। এবং শারীয়াহ'র উপর তাখাসসুস করে রিয়াদে অবস্থিত ইমাম মুহাম্মাদ ইবনে সাউদ ইউনিভার্সিটি থেক মুমতাজ গ্রেডে সনদ লাভ করেন। তিনি সেখানে শারয়ী ইলম অর্জন করেন। তবে অধ্যায়ন সমাপ্ত হয়নি।

অতঃপর তিনি যুদ্ধের ময়দানে রিবাতরত অবস্থায় ইলম অর্জন ও আমল করার জন্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ছেড়ে দেন। এমনকি জাযিরাতুল আরবে তাগুতদের পক্ষ থেকে -তাদের দাবীকৃত- শারয়ী বিচারলায়ের বিচারক হিসেবে মনোনীত হন। কিন্তু তিনি رَحِمَهُ ٱللَّٰهُ তা প্রত্যাখ্যান করেন। কেনইবা তিনি তা প্রত্যাখ্যান করবেন না! আল্লাহ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ বলেন,

﴿ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ ﴾

“প্রকৃতপক্ষে বান্দাদের মধ্যে আলেমগণই আল্লাহকে ভয় করে।”

একজন আলেমে রব্বানী কখনোই তাগুত সরকারের বিচারক হতে পারেন না। শাইখ رَحِمَهُ ٱللَّٰهُ আহলুস-সুগুরদের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার ইচ্ছা পোষণ করেন। তিনি তার সংকল্পে দৃঢ়। সে মোতাবেক ১৪৩১ হিজরী সনের মুহাররম মাসের শুরুর দিকে ২০১০ খ্রিষ্টাব্দে খুরাসান তথা আফগানিস্তানে হিজরত করেন। আল্লাহ جَلَّ وَعَلَا এর এই আদেশ পালনার্থে;

﴿ إنْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ﴾

“তোমরা হালকা ও ভারী উভয় অবস্থায় যুদ্ধে বের হও এবং তোমাদের মাল ও জান নিয়ে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ কর।”

তিনি হিজরত করেন যেন আল্লাহ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ এর পথে তার শত্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে পারেন। দুনিয়ার সুখময় জীবন ছেড়ে দিয়ে যুদ্ধ ক্ষেত্রে চলে গেলেন; তার ইলমকে আমলে বাস্তবায়িত করার জন্য।

তথায় তিনি তানজিম আল-কাইদাহ'তে যোগদান করেন। শাইখ আফগানিস্তানের ভূমিতে ক্রুসেড-জোটের

[108] মাকতাবাতুল বায়্যিনাত কর্তৃক সংকলিত

আক্রমণের জবাব দিতে তার ভাইদের সাথে সামরিক কাজে অংশগ্রহণ করেন। আফগানিস্তানের দুই প্রদেশ কুনুর ও নুরিস্তানের সম্মুখ দিকের অঞ্চলগুলোতে রিবাত (সীমান্ত পাহাড়া) দেন। তিনি ভাইদের সাথে পাকিস্তানী বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন। শাইখ رحمه الله যুদ্ধে সামান্যতম আহত হন। আল্লাহর অনুগ্রহে এই আঘাত তাকে যুদ্ধে যোগ দেওয়া থেকে বিরত রাখতে পারেনি। শাইখ তার জিহাদী জীবনে কয়েকবার নিহত হওয়া থেকে রক্ষা পান।

শাইখ رحمه الله সামরিক কাজের পাশাপাশি দাওয়াতি ও ইলমী কাজসমূহেও যোগদান করেছেন। আল্লাহ তার উপর অনুগ্রহ করেছেন যে, কঠিন পরিস্থিতি থাকা সত্ত্বেও তিনি মুহাজির ও আনসারদের জন্য বেশকিছু উসুলভিত্তিক শারয়ী কোর্স সম্পন্ন করেছেন। শাইখ رحمه الله তার ভাইদের মাঝে যোদ্ধা, শিক্ষক, মুফতি, বিচারক এবং উপদেশদানকারী হয়ে জীবন-যাপন করতেন। আফগানিস্তানের ঘোড়সওয়ারদের সাথে অবস্থান করে তাদেরকে দ্বীন শিক্ষা দিতেন, আল্লাহ তাকে যে ইলম দান করেছেন তার মাধ্যমে তিনি তাদের মাঝে বিচার-ফায়সালা করতেন। এবং তিনি ছিলেন তাদের সবার প্রিয় পাত্র।

খুরাসানে থাকাকালীন শাইখ رحمه الله এর বিভিন্ন বিষয়ের আলোচনা আস-সাহাব মিডিয়াতে প্রকাশিত হয়েছে। দাওলাতুল ইসলামে যোগদানের পরেও উম্মাহ'র জন্য তার ইলমী খিদমত বন্ধ হয়ে যায়নি। এগুলোর মধ্যে শাইখের কতিপয় উল্লেখযোগ্য ইলমী খিদমত -

- কিতাবুত তাওহীদের ব্যাখ্যায় ২৬ পর্বে অডিও লেকচার।
- আস-সাহাব মিডিয়া থেকে পরিবেশিত ভিডিও বক্তব্য "তোমাদের কী হল, যখন তোমাদের বলা হয়, আল্লাহর রাস্তায় (যুদ্ধে) বের হও।"
- আগুন দিয়ে পোড়ানোর মাস'আলা [অডিও লেকচার]
- 'যে ব্যক্তি কাফিরকে কাফির মনে করে না' এই মূলনীতির ব্যাখ্যা [দুই পর্বে অডিও লেকচার]
- আস-সু'আলাতুন নাইজিরিয়্যাহ [কিতাব]
- মুরতাদদের গুরুত্বপূর্ণ বিধানসমূহের ব্যাপারে মুজাহিদগণের দলিল [কিতাব]
- নাওয়াক্বীদুল ইসলামের ব্যাখ্যায় সংক্ষিপ্ত আলোচনা [কিতাব]

শাইখ رحمه الله খুরাসানে ৫ বছর অতিবাহিত করেন ও আল্লাহর শত্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন। তিনি ছিলেন স্বচ্ছ আক্বীদাহ সম্পন্ন ব্যক্তি।

ইরাক ও শামের ভূমিতে তাওহীদের দিপ্তি উজ্জল হল। নববী মানহাজের অনুসারীগণ তাওহীদের পতাকা উড্ডীন করলেন। আল্লাহ তা'আলা তার মুওয়াহহীদ বান্দাগণকে ইরাক ও শামের ভূমিতে কর্তৃত্ব দান করলেন। তার বান্দাগণ তার যমিনে শারীয়াহ বাস্তবায়ন করলেন - যা দীর্ঘ অনেক বছর যাবৎ অনুপস্থিত ছিল। আল্লাহ عز وجل বলেন,

﴿ الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ ۗ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ﴾

"তারা এমন যাদেরকে আমি যমীনে তামকিন (ক্ষমতা) দান করলে তারা সালাত কায়েম করে, যাকাত আদায় করে এবং সৎকাজের আদেশ দেয় ও অসৎকাজ থেকে নিষেধ করে। আর সব কাজের পরিণাম আল্লাহরই জন্য।"

অতঃপর ঐ ফিতনাহ সংঘটিত হয় যা ঘটেছিল জুলানী নামক লোকের বিশ্বাসঘাতকতার মাধ্যমে এবং আমিরুল মু'মিনিন থেকে তার বিচ্ছিন্ন হওয়ার মাধ্যমে। অতঃপর যখন শাইখ رحمه الله তা শুনলেন তখন তিনি আসতে চাইলেন, সংশোধন করতে চাইলেন এবং হক্বপন্থীদের সাথে মিলিত হওয়ার ইচ্ছা পোষণ করলেন। যখন তিনি বিষয়টি উত্থাপন করলেন তখন খুরাসানে আল-কাইদাহ'র লোকেরা আনন্দিত হল। তারা মনে করল, শাইখ তাদের জাবহাত -জাবহাতুল খুসরাহ- তে যাবেন।[109] অতঃপর তারা শাইখ আবু মালিক আত-তামিমী رحمه الله কে মনোনীত করল যেন তিনি জাবহাতুল খুসরাহ'র প্রধান শারয়ী ব্যক্তি হন। এবং তারা ঐ বিশ্বাসঘাতক জুলানীর কাছে প্রেরিত চিঠিতে লিখল যে, দ্রুতই তারা তার জন্য একজন আলেম পাঠাবে। অতঃপর তারা শাইখকে পাঠালো এক দীর্ঘ কষ্টসাধ্য সফরে। আফগানিস্তান থেকে পাকিস্তান, পাকিস্তান থেকে ইরান, ইরান থেকে তুরস্ক হয়ে সবশেষে তিনি খিলাফাহ'র ভূমিতে পদার্পণ করলেন। দাওলাতুল ইসলামের ভূমিতে এসে তিনি অভিভূত হলেন। যখন তিনি এই স্বচ্ছ পতাকা দেখলেন - যার বিজিত ভূমিগুলো আল্লাহর শারীয়াহ দ্বারা শাসিত হয়, যার নিয়ন্ত্রিত ভূমিগুলোতে পরিপূর্ণ তাওহীদ ও আল-ওয়ালা ওয়াল-বারার বাস্তবায়ন হয়, যার সৈনিকগণ একমাত্র আল্লাহর কালিমা বুলন্দ করার উদ্দেশ্যেই লড়াই করে এবং যার নেতাগণ আল্লাহর দ্বীনের ব্যাপারে কোন নিন্দুকের নিন্দা পরোয়া করে না - তখন তিনি বললেন,

"আল্লাহর কসম আমি এদেরকেই সাহায্য করার জন্য এসেছি।"

শাইখ رحمه الله ছিলেন পাহাড়সম দৃঢ়, সম্মানিত এক ব্যক্তি। শামে বিচ্ছিনকারী জুলানীকে ঘনিষ্ঠ করে নেওয়ার কারণে তিনি খুরাসানের তানজিম আল-কাইদাহ'র নেতৃত্বের প্রস্তাবনাকে প্রত্যাখ্যান করেন। শাইখ رحمه الله খিলাফাহ'র বরকতময় ভূমিতে থেকে যওয়ার ইচ্ছা পোষণ করেন। তিনি আমিরুল মু'মিনিন ইবরাহীম ইবনে আওয়াদ আল-হুসাইনী আল-কুরাইশী আল-বাগদাদী رحمه الله কে বাই'আত দিয়ে দাওলাতুল ইসলামে যোগদান করেন। উলাইয়াত হালাবে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন এবং তাতে আহত হন। অতঃপর আল্লাহর অনুগ্রহে আরোগ্য লাভ করেন। এরপরে শাইখ رحمه الله দাওলাতুল ইসলামের গবেষণা ও শিক্ষা অফিসে কাজ করেন। তিনি সকল পর্যবেক্ষক কমিটির অধিন শারয়ী কমিটির দায়িত্বশীল নিযুক্ত হন। তিনি যুদ্ধের ময়দানে বের হওয়ার অনুমতির জন্য আবেদন করেন এবং পিড়াপিড়ি করেন। ফলে তাকে অনুমতি দেওয়া হয়। অতঃপর তিনি হিমস্ প্রদেশের আস-সুখনাহ শহর বিজয় করার যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। যুদ্ধ তীব্র থেকে তীব্র রূপ ধারণ করে। তিনি তার ভাইদের সাথে অগ্রসর হন।

[109] এখানে জাবহাতুল খুসরাহ দ্বারা উদ্দেশ্যে হচ্ছে জাবহাতুন নুসরাহ।

শাইখ رحمه الله উপস্থিত ভাইদেরকে বলেন,

“আল্লাহর কসম! আমি হিমস্ প্রান্তরে জান্নাতের সুঘ্রাণ পাচ্ছি যা আমি আফগানিস্তানের পাহাড়সমূহে পেয়েছি।”

শাইখ رحمه الله শত্রুর হামলায় ১৩-০৫-১০১৫ তারিখে আঘাতপ্রাপ্ত হন এবং নিহত হন। আফগানিস্তানের পাহাড়ি উপত্যকায় ক্রুসেড-জোটের বিমানের গর্জনের মাঝে তিনি যে শাহাদাহ’র তামান্না করেছিলেন হিমস্ প্রান্তরে নুসাইরীদের[110] বিরুদ্ধে যুদ্ধে সে অমিয় শুধা পান করেন - আমরা তার ব্যাপারে এমনটাই মনে করি আল্লাহই তার হিসাব গ্রহণকারী। তিনি চলে গেলেন তার কাঙ্ক্ষিত মানযিলে। তিনি ছিলেন বীরদের মধ্য থেকে একজন বীর।

শাইখ رحمه الله দিন-রাত অব্যাহতভাবে দ্বীনের প্রতিরক্ষাকারী হয়ে দাওলাতুল ইসলামের খিদমত করেন, বেশকিছু ইলমী হালাকা সম্পন্ন করেন, মানুষের মাঝে আল্লাহর শারীয়াহ অনুযায়ী বিচার-ফায়সালা করতেন এবং ঝগড়া-বিবাদ মীমাংসা করতেন। শাইখ رحمه الله ক্বিয়ামুল লাইল পরিত্যাগ করতেন না এবং তিনি ছিলেন উত্তম চরিত্রের দৃষ্টান্ত - অন্তরসমূহ যার কামনা করে।

শাইখ আবু মালিক আত-তামিমী رحمه الله যুদ্ধের ময়দানে তার ভাইদের সাথে দাঁড়িয়ে হাতে হাত রেখে এ কথাগুলো বলেছিলেন,

“কোথায় সেই পুরুষগণ! যারা তাদের ওয়াদা পরিবর্তন করেন না? তারা যেন তাদের হাত বাড়িয়ে দেন, যাতে আমরা বাই’আহ আলাল-মাউত (আমৃত্যু লড়াই করার শপথ) গ্রহণ করতে পারি। হয় বিজয় নয়তো

---

[110] নুসাইরীরা হল বাতিনী ও রাফিদী বাতিনীদের অন্তর্ভুক্ত যারা আলী رضي الله عنه কে ইলাহ সাব্যস্ত করে। এই দলের প্রতিষ্ঠাতা হল মুহাম্মাদ ইবনে নুসাইর আল-বাসরী আন-নামিরী (মৃত্যু-২৭০ হিজরী) যে নবুওয়াত ও রিসালাতের দাবি করেছিল।

তাদের কতিপয় আক্বীদাহ হলঃ

- তারা বিশ্বাস করে, আলী رضي الله عنه ইলাহ।
- তারা দিনে পাঁচ বার সালাত আদায় করে। কিন্তু তাদের সালাতে কোন সিজদা নেই।
- তারা হজ্জ করাকে কুফর এবং মূর্তির ইবাদাত মনে করে।
- তারা মদকে হালাল মনে করে।

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়্যাহ মাজমুউল ফাতাওয়ায় বলেন, “এই সকল ব্যক্তি যাদেরকে নুসাইরী বলা হয় তারা এবং সকল বাতিনীরা ইহুদী ও খ্রিষ্টানদের থেকেও বড় কাফির। বরং তারা মুশরিকদের থেকেও বড় কাফির। তাদের অনিষ্ট যুদ্ধকারী কাফিরদের থেকেও গুরুতর - যেমন তাতার, ইউরোপীয় এবং অন্যান্যরা। তারা সর্বদাই মুসলিমদের শত্রুদের সাথে অবস্থান করে। তারা মুসলিমদের বিরুদ্ধে খ্রিষ্টানদের সাথে অবস্থান করে। মুসলিমদের উপর তাতারদের বিজয়ের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় বাধা ছিল তারাই। তাদের সাহায্যে এবং সমর্থনেই তাতাররা মুসলিমদের দেশে প্রবেশ করেছে এবং খলিফাহ ও মুসলিমদের সুলতানদের হত্যা করেছে।” শেষ।

শাহাদাহ। আল্লাহু আকবার - আমরা আল্লাহর নামে শপথ করছি যে, আমরা পৃষ্ঠপ্রদর্শন করব না, শত্রুর মোকাবেলার সময় আমরা আমাদের চেহারা ফিরিয়ে নেব না। বরং আমরা শত্রুদের ভিতর ইনগ্মিমাসী (শত্রুর ঘাঁটিতে একা ঢুকে পড়া) করব এবং তাদের ভিতর থেকে ধ্বংস করে দেব। তাদের এমন শাস্তি দেব, যেন তাদের উত্তরসূরীরা তা দেখে পালিয়ে যায়; যতক্ষণ না আমরা এই পথে আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করি অথবা আল্লাহ আমাদের বিজয় দান করেন।''

আমাদের অশ্বারোহী চলে গেছে আর শত্রুদের অন্তর হিংসা ও বিদ্বেষে টগবগ করে ফোটে উঠে। পক্ষান্তরে আমাদের অন্তর আনন্দচিত্তে বলে, ইনশা'আল্লাহ চিরস্থায়ী জান্নাতে মানবজাতির নেতার সাথে, নবীগণের সাথে এবং সৌভাগ্যবান সাহাবীগণের সাথে সাক্ষাৎ হবে।''

আমরা বলি, আশাকরি আপনার রক্ত নুর (আলো) হবে যা আমাদের জন্য পথ আলোকিত করবে, যেন আমরা আপনার পদক্ষেপ অনুযায়ী চলতে পারি।

হে আনাস আন-নাশওয়ান! আল্লাহ আপনার উপর রহম করুন এবং আল্লাহ আপনাকে ক্ষমা করুন!

শাইখ আবু মালিক আত-তামিমী তার ওয়াদা পূর্ণ করেছেন এবং আল্লাহ তা'আলা আস-সুখনাহ শহরের বিজয় দান করেছেন।

সকল প্রশংসা জগৎসমূহের রব আল্লাহর জন্য।